# আকাশ রহস্য

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

ও

শ্রীতাপসবালা দেবী

প্রণীত



প্রথম সংস্করণ
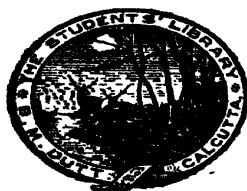

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৩৫

মূল্য দেড় টাকা

# ভূমিকা

মানুষের একটা স্বভাব হচ্ছে—সে জান্‌তে চায়। শৈশব হ'তে শেষ বয়স পর্য্যন্ত এই জান্‌বার আকাঙ্ক্ষা তার সমান ভাবেই থাকে। তাই সে আফ্রিকার ভীষণ জঙ্গলে ছোটে, মেরুপ্রদেশে বা গৌরী-শঙ্করের শৃঙ্গে অভিযান করে, এবং সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুব দেয়। আর আকাশকে জান্‌বার জন্য হয়ত সারাজীবন ধরে' রাত্রির পর রাত্রি অসংখ্য বিচিত্র তারকারাশির দিকে চেয়ে থাকে। পুরাকাল হ'তে পৃথিবীর মনীষিগণ আকাশ সম্বন্ধে যতটুকু জান্‌তে পেরেছেন তারই ইতিহাস হচ্ছে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান। আমাদের বাসভূমি পৃথিবী সৌরজগতের একটি নগণ্য গ্রহ। সৌরজগতের অধিপতি সূর্য্য। মহাশূন্যে সূর্য্য নিতান্তই একটি সাধারণ নক্ষত্র। এই রকম অগণিত নক্ষত্র নিয়ে আমাদের Universe বা বিশ্ব গঠিত; এইরকম আবার অনেক Universe আছে। এরা সব কি, কত বড়, এদের গতি-বিধি কি রকম? দুই Universe এর মাঝখানে কি আছে? ব্রহ্মাণ্ডের এই সংখ্যাতীত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ অসীম শূন্যে কেমন করে' সুশৃঙ্খলতার সহিত ভ্রমণ করে? এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে অতি উচ্চ তাপমাত্রায় জ্যোতিষ্কসমূহে পদার্থ পরমাণু কি অবস্থায় থাকে? প্রোটন-ইলেক্ট্রণের স্বরূপ কি? গ্রহনক্ষত্র কিরূপে জন্ম-লাভ করে? আদি জ্যোতিষ্ক সৃষ্ট হয়েছিল কবে? এসব চর্চ্চা অনন্তকাল ধরে' চল্‌তে পার্‌বে। এই সমুদয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির

জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব নাই,—অনেক অর্থব্যয়ে অনেক পরিশ্রমে বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর দূরবীক্ষণযন্ত্র তৈরী হচ্ছে, মঙ্গলগ্রহে যাওয়া চল্‌তে পারে কি না এজন্য Rocket ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাও কারও অবিদিত নাই।

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই সুন্দর জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চা কেবলমাত্র কোষ্ঠীগণনা ইত্যাদি ফলিত-জ্যোতিষে (Astrology) পর্য্যবসিত আছে। মানুষের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব জান্‌বার জন্য এই ফলিত-জ্যোতিষ। কিন্তু, সেই প্রভাব জান্‌তে হ'লে কিংবা সত্যই তাদের কোন প্রভাব মানুষের উপর আছে কি না তার বিচার কর্‌তে হ'লে গ্রহনক্ষত্রদের গতিবিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমাদের আগে থাকা দরকার। এক সময়ে অবশ্য আমাদের দেশে অনেক পণ্ডিতই ইহার চর্চ্চা করেছেন, তার জন্য অনেক মানমন্দিরও ছিল,—কিন্তু এখন যাঁরা এদেশে গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) আলোচনা করেন, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং পূর্ব্বেকার মানমন্দিরগুলিও এখন মিউজিয়মের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদিনে পাশ্চাত্যদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। এমন কি, তাদের Nautical Almanac দেখেই আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের পঞ্জিকাও তৈরী হচ্ছে।

দেশীয় ভাষায় আকাশের কথা লিখিত না হ'লে এখন আর এদেশে জ্যোতিষের আদর হ'তে পার্‌বে না। আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে দৃশ্যমান আকাশের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসটুকু অতি সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। এর বিষয়বস্তু যাতে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়, তার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। "আকাশ

রহস্য” পাঠ করে’ যদি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বিশেষভাবে শিখ্‌বার জন্য কারো আগ্রহ জাগ্রত হয়,—আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

এই পুস্তকের বিষয়বস্তু Sir James Jeans এর The Universe Around Us, Crowther এর An Outline of the Universe, এবং Lockyer ও Parker এর Astronomy হ’তে সংগৃহীত হয়েছে।

গণিত-জ্যোতিষে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চৌধুরী এম-এস-সি, ও শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এস-সি, এই পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করে’ বিশেষ যত্ন ও শ্রমসহকারে ইহার অসঙ্গতিসমূহ সংশোধিত করে’ দিয়েছেন। ইহার প্রণয়ন ও মুদ্রণকালে শ্রীমতী রেণু দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বর বিশ্বাস, ও শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাদিগকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। চিত্রশিল্পী শ্রীপ্রতুল ব্যানার্জ্জি, শ্রীবলাইবন্ধু রায় ও শ্রীসুবল পাল অনেকগুলি চিত্র এঁকে দিয়েছেন।

এইসকল বন্ধুগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলিকাতা
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

**শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ**
**শ্রীতাপসবালা দেবী**

# সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

# আকাশ রহস্য

## প্রথম অধ্যায়

সুনীল নভোমণ্ডল সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্র-সমন্বিত হ'য়ে একটি বিরাট গ্রন্থের ন্যায় সম্মুখে বিরাজিত। বহু পুরাকালে ইহার দৃশ্যে মুগ্ধ, বিস্মিত আদিম মানব ইহার অধ্যয়ন আরম্ভ করেছিল—আজও গ্রন্থের প্রায় কিছুই পাঠ করা হয়নি। আবিষ্কৃত তথ্যসকল কেবল আরো নূতন অনাবিষ্কৃত তত্ত্বের সন্ধান দেয়—তাই প্রথম জ্যোতিষীর কাছে জ্যোতিষ্কমণ্ডল যেরূপ বিস্ময়ের বস্তু ছিল, আধুনিক জ্যোতিষীর কাছেও সেইরূপই র'য়ে গেছে।

মানুষের জ্ঞানচক্ষু যেদিন উন্মীলিত হ'ল, সেদিন নভোমণ্ডলের দৃশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বস্তু ছিল। ইহার বৈচিত্র্য দেখে সেইদিন হ'তে কবি করেছেন তাঁর কাব্য-রচনা, বিশ্বাসপ্রবণ ভীরুমন জ্যোতিষ্কদের দিয়েছে দেবতার আসন; দার্শনিক ইহাকে মৃত্যুর পরপারে আত্মার গম্যস্থান মনে করেছেন,—আর কৌতূহলী মন সেইদিন হতেই ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করে চলেছে। তাই জ্যোতিষ্কতত্ত্ব মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাণো বিজ্ঞান। স্মরণাতীত কালে বনজঙ্গল বা গিরিগুহাবাসী প্রথম যুগের মানুষ কর্ত্তৃক ইহার উদ্ভব হয়েছিল।

প্রাচীনকালের উন্নত সকল দেশেই জ্যোতির্ব্বিদ্যার নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ এই বিদ্যায় খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ভাব্‌লে

আশ্চর্য্য হ'তে হয়, কোন্ পুরাকাল হ'তে নক্ষত্র ও সৌরজগতের গতিবিধির নিভুর্ল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব ভারতীয় জ্যোতিষী ক'রে এসেছেন। সৌর ও চান্দ্রবৎসর, এবং গ্রহণের কালনির্ণয় সম্বন্ধে কয়েকটি তত্ত্বের জন্য মিশর, মেসোপটেমিয়া ও চীনদেশের কাছে জগৎ ঋণী। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে গ্রীক-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থিতি, আকার ও ভ্রমণ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্যের আবিষ্কার করে' জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সমৃদ্ধ করেছেন। তার পরে মাধ্যাকর্ষণ তথ্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও বর্ণবিশ্লেষক যন্ত্র ত জ্যোতিষের জগতে যুগান্তর আনয়ন করেছে। ইতিমধ্যে সকল প্রকার বিজ্ঞানও দ্রুত উন্নত হ'য়ে জ্যোতিষ জানবার পথে মানুষকে অনেক সহায়তা করছে।

স্থূল সৌরজগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান প্রায় সম্পূর্ণ হবার পরে তার দৃষ্টি প'ড়েছে সুদূর নক্ষত্রজগতে ও নক্ষত্রলোকের পরপারে বাহিরের অসীম বিশ্বলোকে। তাদের সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞান জ্ঞাতব্য বিষয়ের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, তবু তাই জান্‌তে হলেই একটি মানুষের জন্ম কেটে যায়।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## মাধ্যাকর্ষণ

ঊর্দ্ধে আকাশের নক্ষত্ররাজ্যে ভ্রমণ করবার একান্ত ইচ্ছা মানুষের থাক্‌লেও সে সেখানে যেতে পারে না—পৃথিবী তাকে আপনার বক্ষঃসংলগ্ন করে রাখে। সূর্য্যও ভ্রমণশীল পৃথিবীকে অনন্ত আকাশে

ছেড়ে দেয় না—তাকে সতত আকর্ষণ করে' আপনার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করায়। যে আকর্ষণে গ্রহউপগ্রহগণ কক্ষভ্রষ্ট না হ'য়ে নিয়মানুসারে আপন আপন পথে প্রদক্ষিণ করে, যে আকর্ষণে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ ভূমিলগ্ন থাকে—তার নাম মাধ্যাকর্ষণ। প্রতি পদার্থেই এই শক্তি বিদ্যমান।

মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করেন নিউটন। ইহার আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকমহলে সাড়া পড়ে' যায়। গণিত ও অন্যান্য বিজ্ঞানের তখন এত উন্নতি হয়নি—জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনাও করত মুষ্টিমেয় কয়েকজন; সেই যুগে এইরূপ বৃহৎ আবিষ্কার দ্বারা তিনি জ্যোতিষ্ক-তত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করেছিলেন। বিজ্ঞান-জগতে তাই তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে।

কোন চুম্বক পাথর ও একটি ঝুলানো লৌহখণ্ডের সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণ বিষয়টি কতকটা বুঝ্‌তে পারা যায়। চুম্বকটি লৌহের সমীপে আন্‌লে লৌহটি ছুটে চুম্বকের গাত্রলগ্ন হয়ে যায়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে অধিক ব্যবধান থাক্‌লে লৌহ স্থিরই থাকে। একটি মধ্যবর্ত্তী স্থান আছে যেখানে লৌহটি ছুটে চুম্বকে লগ্ন হয় না, আবার ইহার আকর্ষণেরও বাইরে নয়; চুম্বকটিকে নড়ালে লৌহটিতেও অস্থিরতা দেখা দেয়। চুম্বকটিকে পৃথিবী মনে করা যাক্। পৃথিবীর বিরাট দেহের আকর্ষণ আমাদের তুলনায় অনেক বেশী—আমরা অত্যন্ত সমীপে আছি বলে পৃথিবীর বক্ষত্যাগ করতে পারি না, উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত সকল বস্তুই পৃথিবীতে এসে পড়ে এবং ইহার আকর্ষণে বৃষ্টি ও উল্কাপাত হয়। কিন্তু, অধিক দূরবর্ত্তী শুক্রগ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র হ'লেও পৃথিবী তাকে নিজের কাছে

টেনে আন্‌তে পারে না। মধ্যবর্ত্তী স্থানে আছে চন্দ্র, সে পৃথিবীর উপর ছুটেও আসে না, পৃথিবী ছেড়ে পালাতেও পারে না—তাই কিছু দূরে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব নিকটবর্ত্তী পদার্থে অধিক, দূরত্ব যত বেশী, আকর্ষণ তত কম। পৃথিবীর কেন্দ্র হ'তে উপরিভাগের বিষুবপ্রদেশ যতটা দূরে, মেরুপ্রদেশের দূরত্ব ততটা নয়। এজন্য মেরুতে পৃথিবীর যত আকর্ষণ, বিষুবপ্রদেশে তার চেয়ে কম। কেন্দ্র হতে পৃথিবীর উপরিভাগ ৪০০০ মাইল দূরে। যেস্থানের দূরত্ব ইহার দ্বিগুণ, সেখানে আকর্ষণবেগ ইহার এক-চতুর্থাংশ। দূরত্ব ৩ গুণ হ'লে আকর্ষণ হ'বে নয় ভাগের (৩×৩) এক ভাগ, দূরত্ব ১০ গুণ হ'লে আকর্ষণ একশ' (১০×১০) ভাগের এক ভাগ।

মাধ্যাকর্ষণের ফলে সকল পদার্থে ওজন অনুভূত হয়। আমরা সচরাচর বলে থাকি, ভারী বলে' সকল জিনিষ মাটীতে এসে পড়ে। বস্তুতঃ, পৃথিবী আকর্ষণ করে বলে'ই সকল পদার্থ ভূমির দিকে ছুটে আসে। আকর্ষণের জন্যই পদার্থে ওজন পাওয়া যায়। আকর্ষণের বেগ অনুসারে বস্তুর ওজনের তারতম্য হয়। বৃহস্পতির আকর্ষণবেগ পৃথিবীর আড়াইগুণ, এবং চন্দ্রের আকর্ষণবেগ পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ। যে বস্তুর ওজন পৃথিবীতে ৩০ সের, বৃহস্পতিতে তার ওজন ৭৫ সের, চন্দ্রে তার ওজন মাত্র ৫ সের হবে। আবার পদার্থের ঘনত্ব ও পরিমাণানুসারেও ওজনের তারতম্য হয়। প্রস্তর-খণ্ডের ঘনত্ব তূলা অপেক্ষা বেশী। সেজন্য প্রস্তরের ওজন তূলা অপেক্ষা অধিক। বৈজ্ঞানিকেরা ঘরে বসেই ঘনত্ব ও আয়তন জেনে গ্রহ নক্ষত্রের ওজন ঠিক করেন।

ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থেই মাধ্যাকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে। সৌরজগতে এবং নক্ষত্ররাজ্যে এই শক্তির প্রভাবেই এত নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান।

# তৃতীয় অধ্যায়

## পৃথিবী

গৃহে বাতায়নের ধারে বসে আছি, দৃষ্টি রয়েছে সম্মুখের উন্মুক্ত প্রান্তরে। নিতান্ত সমতল—একবার ভ্রমেও কারো মনে আসতে পারে না, প্রান্তরটি সমতল নয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা বিরাট গোলকের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ।

একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের পরিধির কোন অংশে যে বক্রতা, বৃহত্তর বৃত্তের পরিধির সমপরিমাণ অংশে বক্রতা অপেক্ষাকৃত কম। বৃত্তটি খুব বড় হ'লে ক্ষুদ্র অংশের বক্রতা প্রায় ধরাই পড়ে না। পৃথিবী একটি বৃহৎ বর্ত্তুল, প্রান্তরটি তার নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ—এইজন্যই আমরা মাঠকে সমতল দেখি।

পৃথিবী গোলাকার, কেবল উত্তরদক্ষিণে সামান্য চাপা। কথাটা বিশ্বাস ও ধারণা করা বড় কঠিন। দেখা যাক্ ইহার স্বপক্ষে কি যুক্তি আছে।

সমুদ্রতীরে গিয়ে বন্দরাভিমুখী কোন জাহাজকে লক্ষ্য করলে দূরস্থ জাহাজটির সর্ব্বাবয়ব এক সঙ্গে দেখা যায় না। প্রথমে মাস্তুল, তারপরে মধ্যভাগ—এবং জাহাজটি একেবারে নিকটে আসলে পরে

তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। পৃথিবী যদি সমতল হ'ত, তাহ'লে সমস্ত জাহাজটি একসঙ্গেই দেখ্‌তে পাওয়া যেত। পৃথিবী গোলাকার বলে'ই
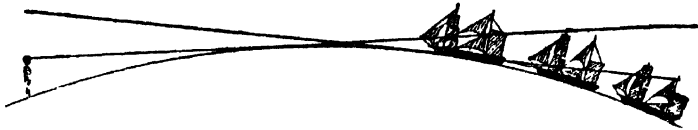
১নং চিত্র—বন্দরাভিমুখী জাহাজ

প্রথমে মাস্তলটি মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং ক্রমশঃ নিম্নভাগ দেখ্‌তে পাই (১ নং চিত্র)।

কোন বিশেষ দিকে লক্ষ্য রেখে যে-কোন স্থান হ'তে যাত্রা করলে অনেকদিন পরে আবার ঠিক পূর্ব্বস্থানেই ফিরে আস্‌তে হয়। অনেকে জাহাজে করে' সাগরপথে এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। ইহার থেকেও বোঝা যায় যে, পৃথিবী গোলাকার।

কোন খোলা মাঠে দাঁড়ালে চতুর্দ্দিকে আকাশ-পৃথিবীর মিলনস্থানে যে দিগন্ত-রেখা দেখা যায়, তা বৃত্তাকার। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। ইহাও পৃথিবীর বর্ত্তুলাকৃতির একটি প্রমাণ।

পৃথিবীর উপর অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বদিকের স্থানগুলিতে সূর্য্যোদয় আগে হয়, পশ্চিমের স্থানগুলিতে তার পরে। যেমন, দিল্লী কলিকাতার পশ্চিমদিকে অবস্থিত বলে' কলিকাতার সূর্য্যোদয়ের পরে দিল্লীতে সূর্য্য ওঠে। পৃথিবী গোল না হ'য়ে সমতল হ'লে সূর্য্যোদয় হওয়া মাত্র সকল স্থান হ'তেই তাকে দেখা যেত।

আমরা দেখতে পাই সূর্য্য ও চন্দ্র গোলাকার। দূরবীক্ষণের সাহায্যে জানা যায় যে, অন্যান্য গ্রহগুলিও বর্ত্তুলাকার। ইহাই স্বাভাবিক যে পৃথিবীও তাদেরই মত একটি বর্ত্তুল।

প্রতিবৎসর চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে, তাহা বৃত্তাকার। কেবল কোন বর্ত্তুলের ছায়াই সকল সময়ে গোলাকার হ'তে পারে।

এই সকল দেখে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পৃথিবী একটি গোলক।

## আয়তন

এক মাইল পথ ধারণা করা খুব কঠিন নয়, পোনের কুড়ি মিনিট হাঁটলেই এক মাইল পথ অতিক্রম করা যায়। কষ্টেস্রষ্টে দশ মাইলের ধারণাও করা যেতে পারে। কিন্তু, পৃথিবীর আয়তনের ধারণা করা বড় সহজ নয়—ইহার পরিধিই হ'ল ২৪,৯০০ মাইল। দিনে পোনের মাইল করে পথ চ'লেও ইহার পরিধি ঘুরে আস্‌তে লাগ্‌বে ১৬৬০ দিন বা ৪½ বৎসর। পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ মাইল বা প্রায় ৮০০০ মাইল। উত্তরদক্ষিণ প্রান্তদ্বয় একটু চাপা, পূর্ব্বেই তা উল্লেখ করা হ'য়েছে। ঐ প্রান্তদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যাসের দৈর্ঘ্য ৭৯০০ মাইল।

## আহ্নিক গতি

পৃথিবী সূর্য্যের সম্মুখে আপন মেরুদণ্ড অবলম্বন ক'রে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। এই আবর্ত্তনের ফলেই দিনরাত্রি হয়। এজন্য এই আবর্ত্তন-গতির নাম দৈনিক বা আহ্নিক গতি। মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করে বলে' মেরুদণ্ড সর্ব্বদা স্থির থাকে। ইহার স্থির প্রান্তদ্বয় পৃথিবীর উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত, সেজন্য এই স্থির বিন্দু দুইটিকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বলে।

২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রত্যেক স্থান ১২ ঘণ্টার জন্য সূর্য্যের সম্মুখীন হয়। সূর্য্যালোকের জন্য এই ১২ ঘণ্টা তার দিন। অপর ১২ ঘণ্টা সূর্য্যের বিপরীতে অন্ধকারে থাকে, তখন তার রাত্রি। পৃথিবীর পরিধি ২৪,৯০০ মাইল, সুতরাং ভূপৃষ্ঠে বিষুবরেখার সমীপস্থ বিন্দুগুলি ঘণ্টায় ১০০০ মাইল বেগে মেরু প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবীর আবর্ত্তন আমরা বুঝ্‌তে পারি না, তাই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হয়। ষ্টীমারের ভিতরে বসে আমরা তার গতি বুঝ্‌তে পারি না; রেলগাড়ীতে বসেও মনে করি আমরা স্থির, আশেপাশের গাছপালা ছুটে চলেছে। এইরূপ অনেক ভুলই আমাদের হয়।

আমরা প্রত্যহ দেখ্‌তে পাই প্রাতঃকালে সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হ'য়ে সন্ধ্যাকালে পশ্চিমে অস্তগত হয়। সূর্য্যাস্তের পর নক্ষত্রগণ সূর্য্যের ন্যায় পূর্ব্বদিকে উদিত হ'য়ে উষাকালে পশ্চিমে অস্ত যায়। এখন, ইহাদের উদয়াস্ত দেখে দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। হয়—পৃথিবী স্থির থাকে, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ পশ্চিমাভিমুখী হ'য়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে; না হয়—সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ স্থির, পৃথিবী পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বদিকে চলে' সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

সূর্য্য আয়তনে পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ। সূর্য্য যে পৃথিবীর ক্ষুদ্র শক্তিতে আকর্ষিত হয়ে তাকে প্রদক্ষিণ কর্‌বে, ইহা সম্ভব নয়। নক্ষত্রগুলিও ত সূর্য্যেরই অনুরূপ, এমন কি অনেকেই সূর্য্য অপেক্ষা বহুগুণ বড়। সুতরাং তাদের পক্ষে ছোট্ট পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করাও অসম্ভব।

আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র হ'ল সূর্য্য, আর তার দূরত্ব হ'ল নয় কোটি সাতাশ লক্ষ মাইল। সূর্য্য যদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে' ২৪ ঘণ্টায় প্রদক্ষিণ করে, তা হ'লে তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক অতিদীর্ঘ বৃত্তপথ ভ্রমণ করতে হবে, যে বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধই হ'ল নয় কোটি সাতাশ লক্ষ মাইল। সূর্য্যের পরেই যে নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটতম তার দূরত্ব আরো ৩ লক্ষ গুণ। অতদূরে থেকে ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে' 'আসতে হলে যে বিপুল গতিবেগের প্রয়োজন, নক্ষত্রগুলির পক্ষে তা অসম্ভব।

ইহা ছাড়া সূর্য্য এবং সকল নক্ষত্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করবে ঠিক ২৪ ঘণ্টায়, একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। চন্দ্র এবং বুধ-শুক্র প্রভৃতি গ্রহের সঙ্গে আমাদের কতকটা পরিচয় আছে। তাদের প্রত্যেকের প্রদক্ষিণকাল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই অসংখ্য নক্ষত্রের ভ্রমণকাল কখনই সমান হতে পারে না।

বুধ, শুক্র এবং অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী অনেকাংশে তাদেরই মত; পৃথিবীও নিশ্চয়ই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণ স্থিরই থাকে, পৃথিবীর আবর্ত্তনের জন্য আমাদের মনে হয় তারা পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণশীল।

## বার্ষিক গতি

আহ্নিক গতি ভিন্ন পৃথিবীর আর একটি গতি আছে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে ক্রমাগত পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বে সরে যায়। এইরূপে ৩৬৫ $\frac{১}{৪}$ বার ঘুরে সে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণ-কালকে

বর্ষ বা বৎসর বলা হয় এবং প্রদক্ষিণ-গতিটির নাম বার্ষিক গতি। ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে আমাদের এক বৎসর। কক্ষবৃত্তে পৃথিবীর ভ্রমণবেগ সেকেণ্ডে ১৮$\frac{১}{২}$ মাইল।

পৃথিবী হ'তে সূর্য্যের দূরত্ব গড়ে নয় কোটি সাতাশ লক্ষ মাইল। সূর্য্যকে কেন্দ্র করে' পৃথিবী বৃত্তপথে ভ্রমণ করে। পৃথিবীর কক্ষ বা পথ প্রায় বৃত্তাকার হ'লেও ঠিক বৃত্ত নয়, ইহা একটি বৃত্তাভাস।

কাগজের উপরে বিভিন্নস্থানে দুইটি আল্‌পিন বিঁধিয়ে তাদের
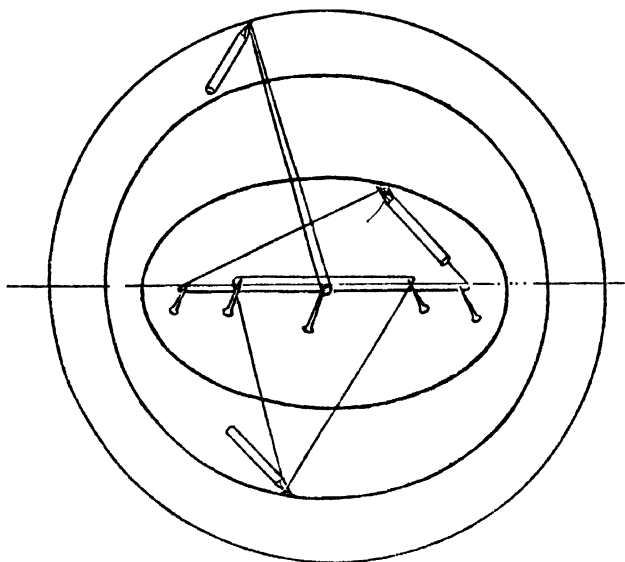
২নং চিত্র—বৃত্ত ও বৃত্তাভাস

কেন্দ্র করে' বেষ্টনী একটি সূতাদ্বারা বৃত্তাভাস অঙ্কিত করা যায়। কেন্দ্র দুইটি যত দূরে থাকে, বৃত্তাভাসটি ততই সরু ও লম্বা হয়। সন্নিকটে রাখলে অধিকতর বৃত্তাকার হয়। কেন্দ্র দুইটিকে এক

বিন্দুতে রাখ্‌লে অঙ্কিত রেখা ঠিক একটি বৃত্ত হয় (২নং চিত্র)। প্রায় সকল গ্রহের কক্ষই বৃত্তাভাস।

কেন্দ্রদ্বয়ের একটিতে সূর্য্যকে রেখে পৃথিবী বৃত্তাভাস কক্ষে পরিভ্রমণ করে। সেজন্য বৎসরের মধ্যে এক সময়ে পৃথিবী সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকে। আমরা তখন সূর্য্যকে ঈষৎ বৃহত্তর দেখি, পৃথিবীর ভ্রমণবেগও একটু বৃদ্ধি পায়। ছয়মাস পরে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা হয়। ১৫ই পৌষ পৃথিবী সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে আসে, এই দিনটিকে সূর্য্যোচ্চ (perihelion) বলে; ইহার
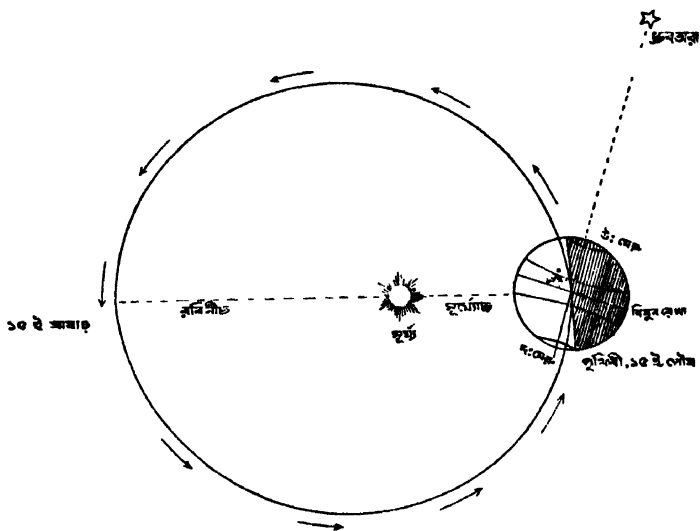
৩নং চিত্র—পৃথিবীর বার্ষিকগতি

ছয়মাস পরে ১৫ই আষাঢ় পৃথিবী সূর্য্য হতে দূরতম প্রদেশে যায়, সেদিনটিকে রবিনীচ (aphelion) বলা হয়।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড সর্ব্বদা স্থির থাকে, ইহার লক্ষ্য থাকে আকাশে ধ্রুবতারার দিকে। মেরুদণ্ডটি পৃথিবীর কক্ষের উপর সরলভাবে দাঁড়ায় না,—ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির রাখ্‌বার জন্যই যেন একটু হেলে কক্ষের সহিত ৬৬½ ডিগ্রীর কোণ উৎপন্ন করে ( ৩নং চিত্র )। ইহাই ঋতুপরিবর্ত্তনের কারণ।

## ঋতুপরিবর্ত্তন

ইন্দ্রের অমরাবতী নাকি চিরবসন্তের দেশ। তাই যদি হয়, তবে অমরাবতী মানুষের বাসের অযোগ্য। ফলফুলশস্যসম্ভারে ও মলয় পবনে বসন্তের মাধুর্য্য অতুলনীয় হ'লেও তাতে বর্ষার ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত নাই, শরতের নীল স্বচ্ছ আকাশ নাই, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপ নাই, শীতের স্নিগ্ধ দিন বা তুষারপাত নাই। ঋতুর বৈচিত্র্যের জন্যই জীবনধারা আমাদের একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে না— ইহাই আমাদের ক্লান্তশক্তির মূলে নবীন প্রেরণা দিয়ে আমাদের সঞ্জীবিত করে।

প্রতিদিনকে আমরা তাপ অনুসারে নানা ভাগে ভাগ করি— উত্তপ্ত অংশকে বলি মধ্যাহ্ন; পূর্ব্বাহ্ণ ও সায়াহ্নকাল নাতিশীতোষ্ণ এবং রাত্রিকাল অপেক্ষাকৃত শীতল। আবার একদিনের সঙ্গে অপরদিনের আব্‌হাওয়ারও তফাৎ থাকে। কোনদিন হয়ত মেঘ্‌লা, কোনদিন সূর্য্যকরোজ্জ্বল, কোনদিন কুয়াসাচ্ছন্ন, কোনদিন আবার বৃষ্টিধারাস্নাত। এইরূপ বৎসরেরও প্রাকৃতিক বিভাগ আছে —তাদের ঋতু বলে। ঋতু প্রধানতঃ চারিটি—গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্ত। প্রতি ঋতু প্রায় তিন মাস কালব্যাপী। বঙ্গদেশে আমরা

আরো দুইটি ঋতু গণনা করে থাকি। গ্রীষ্মের শেষাংশকে বলি বর্ষা এবং শীতের প্রারম্ভকে হেমন্ত।

সূর্য্যরশ্মি হ'তে পৃথিবী তাপ ও আলোক পায়। দীর্ঘতর দিন অধিকতর গরম, কারণ সেদিন সূর্য্যালোক বেশীক্ষণ থাকে। যে দেশ অন্যদেশ অপেক্ষা অধিক সূর্য্যালোক পায়, সেদেশে গ্রীষ্ম অধিক।

মেরুদণ্ডের স্থির প্রান্তদ্বয়ের নাম উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু। উভয়মেরুর ঠিক মধ্যভাগে পৃথিবীপৃষ্ঠে একটি বৃত্ত কল্পিত হয়, তাকে বিষুববৃত্ত বা নিরক্ষবৃত্ত বলে। বিষুববৃত্ত পৃথিবীকে অর্দ্ধভাগে বিভক্ত করে। পৃথিবী ও সূর্য্যের বিষুববৃত্ত প্রায় একই সমতলে আছে।

সূর্য্যকে আমাদের দেশে দ্বিপ্রহরে সাধারণতঃ মাথার উপরে
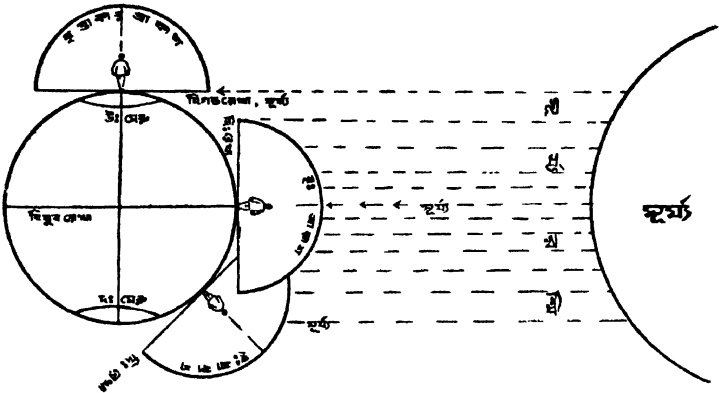
৪নং চিত্র—পৃথিবীর আকাশে সূর্য্য

দেখতে পাই। কিন্তু ক্রমশঃ উত্তরে গেলে দেখি, দ্বিপ্রহরের সূর্য্য

মাথার উপর ওঠে না, দক্ষিণে হেলে আছে। উত্তর মেরুতে ত দ্বিপ্রহরের স্ূর্য্য থাকে দিক্‌চক্রবালরেখায়। বিষুবপ্রদেশ থেকে ক্রমশঃ দক্ষিণে গেলেও দেখি দ্বিপ্রহরের স্থর্য্য উত্তরে হেলে আছে (৪নং চিত্র)। অর্থাৎ বিষুবপ্রদেশে স্থর্য্যরশ্মি সরলভাবে পড়ে, উত্তর দক্ষিণে পড়ে তির্য্যক্‌ভাবে। আমরা জানি বিষুবপ্রদেশের তাপমাত্রা অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশী, উত্তর দক্ষিণে ক্রমশঃ কম। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, স্থর্য্যরশ্মি সরলভাবে পড়ে বলে' বিষুব-প্রদেশে গরম বেশী, মেরুপ্রদেশে তির্য্যক্‌ভাবে পড়ে বলে' সেখানে এত শীত। বিষয়টি ৫নং চিত্র থেকে সহজে বোঝা যাবে।
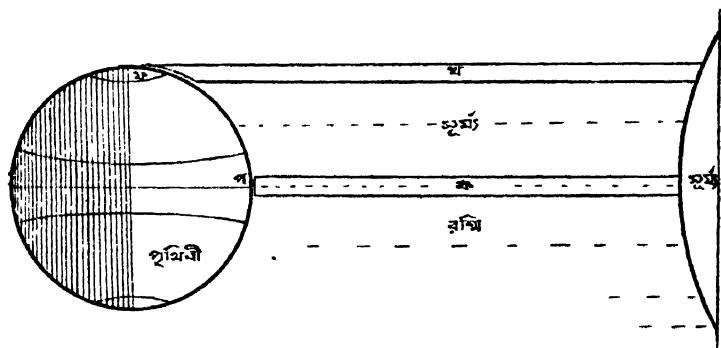
৫নং চিত্র—স্থর্য্যের সরল রশ্মি ও তির্য্যক্ রশ্মি

(ক) ও (খ) রশ্মি পরিমাণে সমান। (ক) ও (খ) পৃথিবীর (প) ও (ফ) স্থানের উপর পড়ে। পৃথিবীর বর্তুলত্বের জন্য (প) অপেক্ষা (ফ) দীর্ঘ, অর্থাৎ সমপরিমাণ স্থর্য্যরশ্মি বিষুবরেখার নিকট যে পরিমিত স্থানের উপর পড়ে, অন্যস্থানে তার চেয়ে অধিকস্থানের উপর পড়ে। ইহাই উভয়স্থানের তাপের বিভিন্নতার কারণ।

আমাদের জানা রইল, সূর্য্যরশ্মি সরলভাবে পড়্‌লে গরম বেশী হয়, যত তির্য্যক্‌ভাবে পড়ে, শীত তত বেশী।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষের সহিত সর্ব্বদা ৬৬½ ডিগ্রীর কোণ উৎপন্ন করে' সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহাই ঋতুপরিবর্ত্তনের কারণ। যদি পৃথিবী সরলভাবে দাঁড়াত, তাহ'লে সমস্ত বৎসর বিষুববৃত্তের নিকট প্রচণ্ড গ্রীষ্ম হ'ত, ক্রমশঃ উত্তর দক্ষিণে হ'ত শীতাধিক্য; একই স্থানের তাপ সারাবৎসর সমভাবেই থাক্‌ত বলে' প্রকৃতিকে আর বিভিন্ন-রূপে দেখা যেত না।

৯ই চৈত্র পৃথিবী কক্ষের উপর (ক) চিহ্নিত স্থানে (৬ নং চিত্র) আসে। সূর্য্যের সরলরশ্মি সেদিন বিষুবরেখার উপর পড়ে, এবং পৃথিবীর সর্ব্বাংশ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার ঘণ্টা আলোকিত হয়, বার ঘণ্টা অন্ধকারে থাকে। সেদিন দিবারাত্রি সমান। তখন পৃথিবীর বসন্তকাল, সর্ব্বত্রই অপেক্ষাকৃত নাতিশীতোষ্ণ তাপ। তার পরদিন হ'তে সরল রশ্মি ক্রমশঃ উত্তরদিকে পড়ে। উত্তর গোলার্দ্ধের অর্দ্ধাংশেরও অধিক স্থান একই কালে সূর্য্যালোকে থাকে, সেজন্য দিবা দীর্ঘতর হয়, গ্রীষ্মও অধিক হ'তে থাকে। বিষুবরেখার দক্ষিণভাগ দিনের অপেক্ষাকৃত অধিক সময় অন্ধকারে থাকে, সেখানে রাত্রিকাল হ'য়ে পড়ে দিবসের চেয়ে দীর্ঘ। এইরূপে তিনমাস চলে' ৯ই আষাঢ় পৃথিবী (খ) চিহ্নিত স্থানে আসে। সরলরশ্মি সেদিন যে স্থানে পড়ে, পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর সেই কল্পিত বৃত্তের নাম কর্কট-ক্রান্তি। ইহা বিষুবরেখার ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে। চিত্র হ'তেই বোঝা যাবে, উত্তর গোলার্দ্ধে রজনী অপেক্ষা দিবা দীর্ঘ, উত্তর

গোলার্দ্ধে এখন গ্রীষ্মকাল। উত্তরমেরুর সন্নিকটবর্ত্তী স্থান চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্য্যালোকে থাকে, সেখানে প্রায় পাঁচ মাস ব্যাপী দীর্ঘদিবস
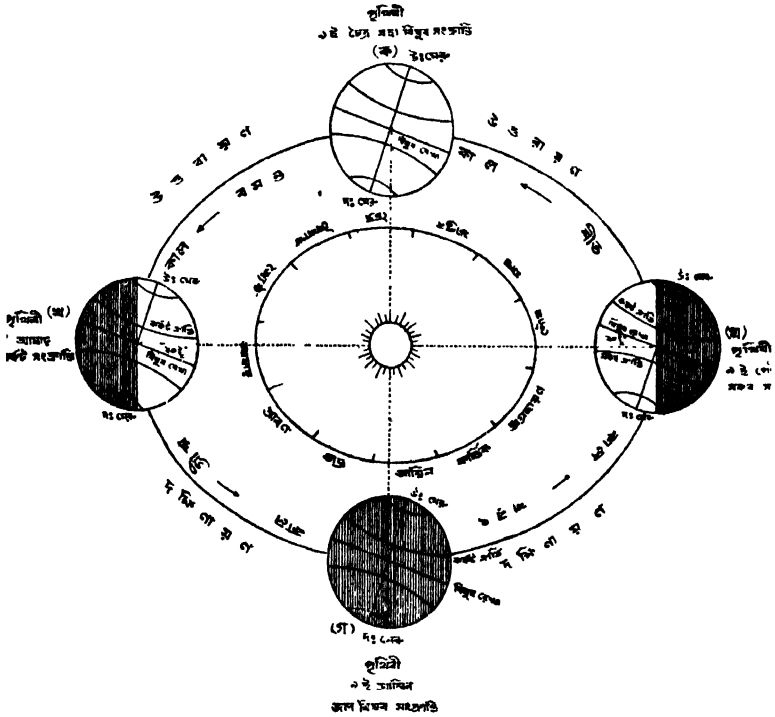
৬নং চিত্র—ঋতু পরিবর্ত্তন

হয়। লণ্ডনে সতের ঘণ্টা দিবস ও সাত ঘণ্টা রাত্রি হয়, বঙ্গদেশেও প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা দিবস ও দশ ঘণ্টা রাত্রিকাল। উত্তর গোলার্দ্ধে ৯ই আষাঢ়ে দিবাভাগ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ।

৯ই আষাঢ়ের পরে সরল রশ্মি দক্ষিণাভিমুখী হয়। এখন সূর্য্যের

দক্ষিণায়ন আরম্ভ হ'ল। তিন মাস পরে ৯ই আশ্বিন (৬ নং চিত্র গ) তারিখে সরলরশ্মি পুনর্ব্বার বিষুববৃত্তের উপর পড়ে' পৃথিবীকে দ্বিতীয়বার নাতিশীতোষ্ণ অবস্থায় রাখে, দিবা ও রাত্রি সেদিন সমান হয়। এখন উত্তর গোলার্দ্ধে শরৎ ঋতু, দক্ষিণে বসন্ত।

ইহার তিনমাস পরে ৯ই পৌষ পৃথিবী (ঘ) চিহ্নিত স্থানে আসে। সেদিন যেস্থানে সরলরশ্মিপাত হয়, পৃথিবীর উপর সেই বৃত্তের নাম মকর-ক্রান্তি। সূর্য্যের দক্ষিণায়ন আজ শেষ হ'ল ছয় মাসের মত। এখনকার সকল অবস্থা (খ) চিহ্নিত অবস্থার ঠিক বিপরীত। উত্তর গোলার্দ্ধে শীতকাল, উত্তর মেরুর সন্নিকটে প্রায় পাঁচ মাস ব্যাপী রাত্রি, লণ্ডনে সাত ঘণ্টা দিবা, সতের ঘণ্টা রাত্রি ও বঙ্গদেশে দশ ঘণ্টা দিবা, চৌদ্দ ঘণ্টা রাত্রি। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে এখন গ্রীষ্মকাল।

ইহার পরদিন হ'তে সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। সরলরশ্মি উত্তরগামী হ'য়ে ৯ই চৈত্র পুনর্ব্বার (ক) চিহ্নিত স্থানে পড়ে। বর্ষচক্রে এইরূপে পৃথিবী তার ভ্রমণ সমাপন করে।

৯ই চৈত্র ও ৯ই আশ্বিনকে যথাক্রমে মহাবিষুব সংক্রান্তি ও জলবিষুব সংক্রান্তি বলে। ৯ই আষাঢ় ও ৯ই পৌষকে বলা হয় কর্কটসংক্রান্তি ও মকরসংক্রান্তি—ঐ দুইদিন সূর্য্য যে সকল নক্ষত্র-পুঞ্জের সন্নিকটে থাকে, তাদের নামানুসারে।

## পৃথিবী ও চন্দ্র

সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী। সেইরূপ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চন্দ্র। পৃথিবী সূর্য্যের একটি গ্রহ, সেজন্য চন্দ্রকে উপগ্রহ বলে। চন্দ্র আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্ক।

পুরাণে আছে, সমুদ্রমন্থনের সময় লক্ষ্মী যখন সমুদ্র হতে উত্থিত হন, তাঁর অন্যান্য বহু সঙ্গীর সহিত চন্দ্রমাও সমুদ্রগর্ভ হতে উঠে সেদিন থেকে আকাশে বিরাজ করেন। আখ্যায়িকাটি বড় মিথ্যা নয়। বহুকাল পূর্ব্বে কোনদিন পৃথিবীর দেহসমুদ্র মথিত হওয়ায় পৃথিবী হ'তে চন্দ্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

চন্দ্রের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় বেশী নয়, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যেই একটি চন্দ্রকে নিমজ্জিত করে রাখা যায়।

চন্দ্রকে আমরা আকারে সূর্য্যের মতই দেখি, শুধু ইহা অত উজ্জ্বল নয়। ইহার উদয়াস্তের সময় প্রত্যহ এক নয়। দিবসে আকাশে চন্দ্র উদিত থাকলেও সূর্য্যালোকে নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়।

চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যালোকে আলোকিত হয়। রাত্রিকালে অন্ধকারের মধ্যে সেই আলোক সে আবার পৃথিবীর উপর প্রতি-ফলিত করে। সেই প্রতিফলিত আলোকই পৃথিবীর চিররহস্যময়ী জ্যোৎস্না।

চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা হয়। ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে চন্দ্র অতি প্রাচীনকাল হ'তেই প্রধান স্থান অধিকার করে' আছে।

৭ নং চিত্র — চন্দ্রের উপরিভাগ

# চতুর্থ অধ্যায়

## চন্দ্র

### আয়তন ও গুরুত্ব

দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রিকালে চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ আমাদের আলোক দান করে; ইহাদের মধ্যে চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। নক্ষত্র ও সূর্য্যের তুলনায় চন্দ্র আমাদের অতিশয় নিকটবর্ত্তী, সেজন্যই আমরা ইহাকে বৃহৎ দেখি। পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রও একটি বর্ত্তুল; ইহার ব্যাস ২১৬০ মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। ৫০টি চন্দ্র দ্বারা পৃথিবীর সমায়তন একটি গোলক গড়া যায়, কিন্তু সেটা ওজনে পৃথিবীর চেয়ে হাল্কা হবে। ৮০টি চন্দ্রের ওজন পৃথিবীর ওজনের সমান।

### চন্দ্রের উপরিভাগ

দূরবীক্ষণদ্বারা চন্দ্রের উপরিভাগে কতকগুলি অত্যুজ্জ্বল অংশ ও কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ অংশ দৃষ্টিপথে আসে ( ৭নং চিত্র )। ভাল করে দেখ্‌লে জানা যায়, অত্যুজ্জ্বল অংশগুলি সূর্য্যালোকিত উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ও কৃষ্ণবর্ণ অংশগুলি নিম্নতর অংশে ঐ পর্ব্বতগুলির ছায়া। ঐ কৃষ্ণবর্ণ ছায়াই চন্দ্রের 'কলঙ্ক' বা 'শশ'। পর্ব্বতগুলির অধিকাংশই আগ্নেয়গিরি—প্রায় প্রতি শৃঙ্গই এক একটি আগ্নেয়গিরির মুখ।

চন্দ্রের পর্ব্বতগুলির নামকরণও করেছে পৃথিবীর মানুষ—প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি বহু শৃঙ্গ আছে। সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের নাম

লিব্‌নীজ্‌, পার্শ্ববর্ত্তী নিম্নসমতল হ'তে ৪১,৯০০ ফিট উচ্চ। চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবী অপেক্ষা অনেক শীতল হ'য়ে গেছে—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎ-পাতও সম্ভবতঃ আর হয় না—হ'লেও নিতান্ত সামান্য।

চন্দ্রমণ্ডলে কোন জীবজন্তু বা উদ্ভিদাদি থাক্‌তে পারে না। জল ও বায়ু প্রাণীর জীবন। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগে জলের চিহ্নমাত্র নাই। জল থাক্‌লে সূর্য্যালোকে নিশ্চয়ই জলীয় অংশ মাঝে মাঝে খুব উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে দূরবীক্ষণে ধরা দিত। চন্দ্রে বায়ুমণ্ডলও সম্ভবতঃ নাই। চন্দ্রের স্বীয় কক্ষে ভ্রমণের জন্য রাত্রিকালে কোন কোন নক্ষত্র চন্দ্রের অন্তরালে গিয়ে আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হ'য়ে পড়ে। চন্দ্রে যদি বায়ুমণ্ডল থাক্‌ত, তবে নক্ষত্রটি ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হ'য়ে পরে দৃষ্টির অগোচর হ'ত। কিন্তু তা হয় না—যতক্ষণ দেখ্‌তে পাই, ইহা সমভাবেই উজ্জ্বল থাকে, চন্দ্রমণ্ডল হ'তে বহির্গত হওয়া মাত্রও সমভাবেই উজ্জ্বল দেখা যায়। এর থেকে অনুমিত হয় যে, চন্দ্রে বায়ু নাই।

জলবায়ু না থাক্‌লে কোন উদ্ভিদ্‌ থাকতে পারে না—যেখানে উদ্ভিদাদি নাই, জলবায়ুও নাই, সেখানে কোন প্রাণী বাস কর্‌তে পারে, ইহা আমাদের ধারণাতীত। কাজেই আমরা অনুমান করি, চন্দ্রলোকে কোন প্রাণী নাই। পৃথিবীতে জলবায়ু আছে বলে'ই ঝড়বৃষ্টি হয়, তার দ্বারা পাহাড় পর্ব্বত ক্রমশঃ ভেঙ্গেচুরে সমতলের সৃষ্টি হয়। চন্দ্রলোকে জলবায়ু না থাকায় সেখানে সমতল নাই, ইহা কেবল পর্ব্বত-সমাকীর্ণ।

পৃথিবীতে ঋতুপরিবর্ত্তন না থাক্‌লে মানুষের জীবনধারায় কোন বৈচিত্র্য থাক্‌ত না। চন্দ্রমণ্ডলে ঋতুপরিবর্ত্তন নাই, কারণ চন্দ্র তার

কক্ষের উপর প্রায় সরলভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবীর মত হেলে নাই। সুতরাং কবির চক্ষে চন্দ্রের সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হ'লেও চন্দ্র বাস্তবিকপক্ষে সুন্দর নয়—একদিন গিয়ে পিক্‌নিক্ কর্‌বার মত স্থানও নয়। চন্দ্রকে দূর হ'তেই দেখা ভাল।

তবে একটি বিষয়ে চন্দ্রে আমোদ পাওয়া যাবে। চন্দ্রপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ। যে মানুষের ওজন পৃথিবীতে ৪৮ সের, চন্দ্রে তার ওজন হবে ৮ সের মাত্র। এখানে যে একমণ ওজন তুল্‌তে পারবে, চন্দ্রে সে ছয় মণ তুল্‌তে পার্‌বে। পৃথিবীর উপর চলাফেরায় অভ্যস্ত মানুষ এক পা চল্‌তে গিয়ে দেখবে, সে অনেকটা বেশী এগিয়ে গেছে।

## চন্দ্রের গতি

পৃথিবী থেকে চন্দ্র ২৪০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে' ঘুরে আস্‌তে চন্দ্রের ২৭ দিন লাগে; কিন্তু এদিকে পৃথিবীও ঐ সময়ে আপন কক্ষে কিছুদূর অগ্রসর হয়—সেজন্য চন্দ্রের পথ আরো দীর্ঘতর হ'য়ে পড়ে। চন্দ্র একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ২৯½ দিনে। ২৯½ দিনে এক চান্দ্রমাস।

পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, আবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চন্দ্র। সুতরাং চন্দ্র বৃত্তপথে ঘুর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেও চন্দ্রের কক্ষ বৃত্তাকার নয়। উহার পথ কিরূপ হয় তা ৮ নং চিত্রে দেখান হ'ল।

পৃথিবীর কক্ষবৃত্তের যে সমতল, চন্দ্রকক্ষ তার সঙ্গে পাঁচ ডিগ্রীর কোণ উৎপন্ন করে (৯ নং চিত্র)। চন্দ্রকক্ষের সমতল ও পৃথিবী-কক্ষের সমতল—উভয়ের ছেদবিন্দুদ্বয়ের নাম রাহু ও কেতু।

সাতাশ দিনে চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, মেরুদণ্ডের উপর তার আবর্ত্তনকালও সাতাশ দিন। সেজন্য এক-অর্দ্ধাংশই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরান থাকে। ইহার দিবা ১৩½ দিন, রাত্রিও ১৩½ দিন। দিবাভাগে এত বেশীক্ষণ সূর্য্যরশ্মি পাওয়ায় অর্দ্ধাংশে প্রচণ্ড গরম
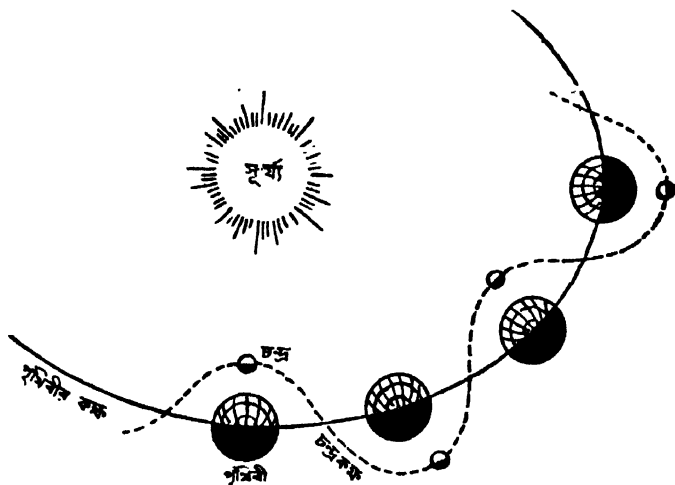
৮নং চিত্র—সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রের গতি

হয়, নিশাকালে সেইরূপ এতদিন সূর্য্যতাপ-বিরহিত থাকায় বাকী অর্দ্ধাংশে অত্যন্ত শীত পড়ে।

পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চন্দ্রের ৩৫৪'৪ দিন লাগে। চন্দ্র তার আলোক ও উত্তাপ পায় সূর্য্য থেকে।

## চন্দ্রকলা ও তিথি

চন্দ্র এবং অন্যান্য যে সকল গোলক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাদের অর্দ্ধাংশ সর্ব্বদা আলোকোজ্জ্বল ও অর্দ্ধাংশ অন্ধকারাবৃত থাকে। পৃথিবীর মানুষ কোন দিন চন্দ্রের উজ্জ্বল অর্দ্ধাংশের সমস্তটাই
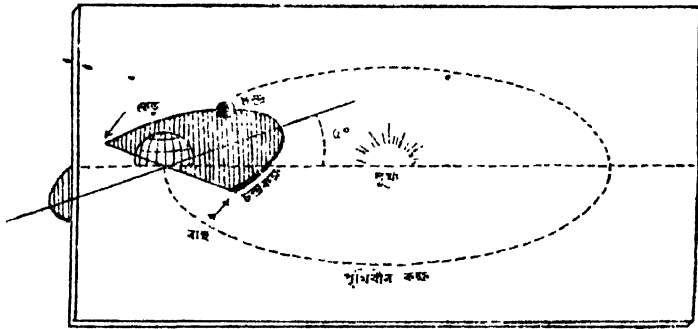
৯নং চিত্র—পৃথিবীকক্ষ ও চন্দ্রকক্ষ

দেখ্‌তে পায়, কোনদিন বা কিছু উজ্জ্বল অংশ, কিছু ছায়াবৃত অংশ তার সম্মুখে থাকে। মানুষ যদি সূর্য্যের অধিবাসী হ'ত, এবং তখনও চন্দ্রদর্শন সম্ভব হ'ত, তাহ'লে কিন্তু প্রত্যহই সে পূর্ণচন্দ্র দেখ্‌তে পেত।

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু আলোকিত হয় সূর্য্যরশ্মিতে। সেজন্য তার যে অংশে সূর্য্য আলোক দান করে, অর্থাৎ যে অংশ সূর্য্যের সম্মুখে থাকে, সে অংশ পৃথিবীর দিকে ফিরান না-ও থাক্‌তে পারে। সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে যেদিন চন্দ্র আসে, সেদিন আলোকিত অংশ থাকে আমাদের বিপরীতে। এতদূর হ'তে অন্ধকার

অংশ আমরা দেখ্‌তে পাই না—কাজেই সেদিন চন্দ্রকে দেখাই যায় না ( ১০ নং চিত্র )। সেদিন অমাবস্যা তিথি। চন্দ্র আবার ঘুরুতে ঘুরুতে কয়েকদিন পরে পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দিকে যায়—পৃথিবী থাকে সূর্য্য ও চন্দ্রের মাঝখানে। সেদিন আলোকিত সম্পূর্ণ অংশটি আমরা দেখি, তাই ঐ দিনে পূর্ণিমা তিথি। অমাবস্যার পর থেকে প্রত্যহ চন্দ্রের এক এক অংশ বা কলা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার
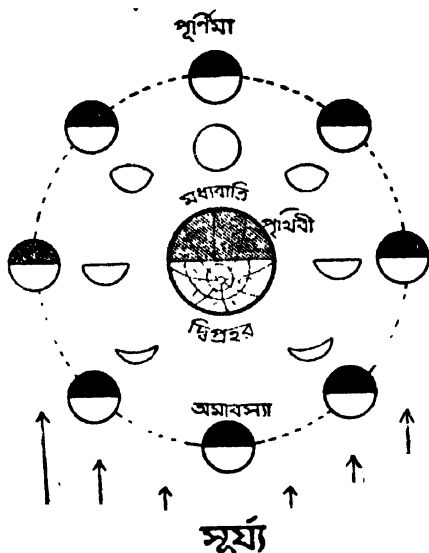
১০নং চিত্র—চন্দ্রের কলা

দ্বারা আমরা কলার হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব রাখি। তমসাবৃত বাকী অংশটি আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরে থাকে। কেবল অমাবস্যার পরে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত চন্দ্রের তমসাবৃত অংশও আমরা অস্পষ্টভাবে

দেখ্‌তে পাই। সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে যদি চন্দ্রে গিয়ে পড়ে, তাহ'লে তার অন্ধকার অংশ আমরা ঐরূপ আব্‌-ছায়া দেখি। তারপরে যখন চন্দ্ররশ্মি অধিক উজ্জ্বল হয়, তখন আর অস্পষ্ট অংশ দেখা যায় না।

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ২৯½ দিনে। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে ২৯½ দিনকে ৩০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ভাগের নাম তিথি। একটি তিথি প্রায় একদিন ব্যাপী। অমাবস্যার পরে প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, এইরূপ চতুর্দ্দশীর পরে পূর্ণিমা, এই ১৫টি তিথি। পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা পর্য্যন্ত আবার প্রতিপদ হ'তে আরম্ভ করে' ১৫টি তিথি। অমাবস্যার পরে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ১৫ দিনকে শুক্লপক্ষ বলে, পূর্ণিমার পর হ'তে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ ; শুক্লপ্রতিপদের চাঁদ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

## চন্দ্রগ্রহণ

এক রাত্রে হঠাৎ একখানি কালো ছায়া এসে ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্রকে আড়াল করে। ইহাকে চন্দ্রগ্রহণ বলা হয়। রাহু-দৈত্য না কি চন্দ্রকে গ্রাস করে ; পৃথিবীকে জ্যোৎস্নাবিহীন দেখে ইন্দ্র তাড়াতাড়ি রাহুর গলা দেন কেটে, তাই কাটা গলার মধ্য দিয়ে চন্দ্র আবার বেরিয়ে আসে। এইজন্যই গ্রহণ লাগে ও ছাড়ে, ইহা এখনও সাধারণের বিশ্বাস।

মানুষের চক্ষে গ্রহণ নিতান্ত অনিয়মিত ঘটনা। উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে বিরাজ কর্‌ছে, হঠাৎ তার উপর একটা কালো পর্দ্দা পড়্‌ল—আবার পর্দ্দাটিও চন্দ্রেরই ন্যায় গোল। বিস্মিত মানুষ

তাই পুরাকালে গ্রহণ দেখে ভয় পেয়েছে, আবার প্রতিবৎসরই গ্রহণ লাগ্‌ছে দেখে তার আইনকানুনও বা'র কর্‌বার চেষ্টা করেছে। সকল দেশের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রথম আবিষ্কৃত তথ্যগুলি গ্রহণ সম্বন্ধেই।

ঐ কালো বস্তুটি রাহু দৈত্য ত নয়ই, তেমন গণ্যমান্যও কেউ না। উহা পৃথিবীর ছায়ামাত্র। আলোকের ঠিক বিপরীতে একটি ছায়া পড়ে। সূর্য্য-প্রদীপের আলোকের জন্য পৃথিবীর একটি ছায়া সর্ব্বদাই আকাশে পড়্‌ছে। সে ছায়া যেদিন চন্দ্রের উপর পড়ে, সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হয় (১১ নং চিত্র)। চন্দ্র সূর্য্যের ঠিক বিপরীত
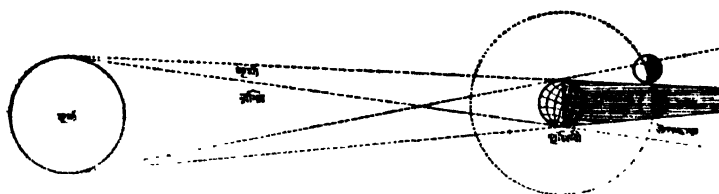
১১নং চিত্র—চন্দ্রগ্রহণ

দিকে থাক্‌লে এবং সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় অবস্থিত হ'লে গ্রহণ হয়। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, সকল পূর্ণিমা তিথিতেই ত চন্দ্র সূর্য্যের বিপরীতে থাকে, তবে প্রতি পূর্ণিমাতেই গ্রহণ হয় না কেন! না হওয়ার কারণ ইতিপূর্ব্বে বলেছি,—চন্দ্র-কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের সহিত এক সমতলে অবস্থিত নয়, ইহার সহিত পাঁচ ডিগ্রীর কোণ উৎপন্ন করে। একই সমতলে থাক্‌লে প্রতি পূর্ণিমায় গ্রহণ হ'তে পার্‌ত। সমতল এক নয় বলে' পৃথিবীর ছায়া প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রের উপর পড়ে না। শুধু সমতল দুইটির

ছেদবিন্দু রাহু বা কেতুর উপর যখন চন্দ্র থাকে, তখন যদি পূর্ণিমা হয়, তবেই সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

মাঝে মাঝে গ্রহণের সময় পূর্ণগ্রহণ হয় না, আংশিক হয়। ইহাও এক সমতলে না থাকার জন্যই। পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে চন্দ্রের যতটুকু অংশ আস্‌তে পারে, ততটুকুই কালো বা গ্রস্ত দেখায়।

পৃথিবীর ছায়া ভিন্ন উপচ্ছায়াও আছে, তারা অনেক অধিক-স্থানব্যাপী। উপচ্ছায়াতে প্রবেশ কর্‌লে চন্দ্রকে কিছু হীনপ্রভ দেখায়, গ্রহণের মত কালোছায়া দেখা যায় না। সেজন্য ঐ সব উপচ্ছায়া-প্রবেশকে গ্রহণ বলে' ধরা হয় না।

বৎসরে চন্দ্রগ্রহণ না-ও হ'তে পারে, আবার তিনটি পর্য্যন্তও হ'তে পারে—তবে পূর্ণগ্রহণ একাধিক হয় না।

# পঞ্চম অধ্যায়

## সূর্য্য

বেদের আরম্ভে আছে সূর্য্যস্তব। মহাভারতে কর্ণের সূর্য্য-পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগ হ'তেই সূর্য্যপূজা এদেশে প্রচলিত আছে, এখনও লুপ্ত হয়নি। রজনীর অন্ধকারের কালো আবরণ ভেদ করে' উষার অরুণোদয় মানুষের কাছে দেবতার আবির্ভাবেরই মত। উজ্জ্বলতায়, সৌন্দর্য্যে, শক্তিতে, আয়তনে, সূর্য্য আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে' আছে।

তাই সূর্য্যকে আদিকাল হতে সকল দেশ দেবতার আসন দিয়ে এসেছে।

সূর্য্য হ'তে পৃথিবী তার দেহ পেয়েছে, পৃথিবীর চেতন ও অচেতন সকল বস্তুর সৃষ্টি ও বিবর্ত্তনের মূলে আছে সূর্য্য। সূর্য্যালোকে পৃথিবীতে রাত্রির পরে দিবার আগমন হয়, পৃথিবীর দৃশ্য দৃষ্টিপথে এসে আমাদের রূপবোধ জাগ্রত করে; নদীপর্ব্বত, গগনমণ্ডল সূর্য্যকিরণ হ'তে বিচিত্র বর্ণ ল'য়ে অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়; চন্দ্র ও গ্রহগণ সূর্য্যালোকেই উজ্জ্বল হ'য়ে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আলোক অপেক্ষা সুন্দর আমরা কিছু জানি না—মহাদ্যুতিময় সূর্য্যই আমাদের দৃশ্য-পদার্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল।

সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবাহ উৎপন্ন হয়, ঝড় ঝঞ্ঝাঘাতে পর্ব্বতাদি ভেঙ্গে চুরে পৃথিবীর স্থানে স্থানে সমতল সৃষ্টি করে' মানুষের বাসযোগ্য করে' তোলে, পর্ব্বতশৃঙ্গের তুষার গলে' নদনদী পরিপূর্ণ হয়। এই তাপদ্বারা জল বাষ্পীভূত হ'য়ে ধারাবর্ষণে পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করে, ধরণীকে শস্যশ্যামল করে। অরণ্যের বৃক্ষাদি সূর্য্যের তাপ ও আলোক আপন আপন দেহে সঞ্চিত করে' রাখে, আবার মানুষ আপন প্রয়োজনমত সেই তাপ ও আলোক ব্যবহার করে' থাকে। সূর্য্যকিরণের অভাবে পৃথিবীতে একটানা রাত্রি হ'ত এবং পৃথিবী থাকৃত চিরতুষারাবৃত।

পৃথিবীকে সূর্য্য যে তাপ ও আলোক দেয়, এমন ২০০ কোটি পৃথিবীকে সে এইরূপ তাপ ও আলোক দিতে পারে। সূর্য্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা ৬০০০ সেন্টিগ্রেড, যেখানে পৃথিবীপৃষ্ঠের

সাধারণ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী নয়। সূর্য্য-মণ্ডলের এক ঘন গজ পরিমিত স্থান এক ঘণ্টায় যে তাপ বিকীরণ করে, সে তাপ পৃথিবীতে উৎপন্ন করা যেতে পারে ১৭০ মণ কয়লা জ্বালিয়ে।

আয়তনে সূর্য্য পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ, সেজন্য পৃথিবী তার বিপুল আকর্ষণের বশীভূত হ'য়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে, কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে আকাশে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় না।

## আয়তনাদি

সূর্য্যের ব্যাস ৮৬০,০০০ মাইল। ইহা পৃথিবী হ'তে ৯২,৭০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবীর আয়তনই আমরা ধারণা করিতে পারি না—সূর্য্যকে ভেঙ্গে ১৩ লক্ষ পৃথিবী গড়া যায়। এইরূপ একটি পৃথিবীর ওজন অবশ্য পৃথিবীর চেয়ে কম হবে, কারণ আয়তনে সূর্য্য পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ হ'লেও ওজনে মাত্র ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ।

যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল গামী কোন মোটরে চড়ে' সূর্য্যের পরিধি ঘুরতে আরম্ভ করা যায়, ভ্রমণ সম্পূর্ণ হবে পাঁচ বৎসর পরে—তা-ও যদি পথিমধ্যে গাড়ী একবারও না থামান যায়, কিংবা টায়ার একবারও না ফাটে।

## সৌরমণ্ডল

পৃথিবীকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল, সে-ও পৃথিবীর অংশ। তেমনি সূর্য্যের উপরও মণ্ডল আছে, তবে একটি নয়, দুইটি।

সূর্য্যের দিকে তাকালে আমরা চক্ষু বন্ধ করতে বাধ্য হই—ইহা

এত উজ্জ্বল। দূরবীক্ষণে ঐ উজ্জ্বল অংশটিকে মেঘের ন্যায় স্তরীভূত দেখায়। ইহাকে সূর্য্যের আলোকমণ্ডল (Photosphere) বলা হয়। পৃথিবী প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক আলোকমণ্ডলের রশ্মি দ্বারা আলোকিত হয়।

আলোকমণ্ডলের নীচের অংশকে সূর্য্যকলঙ্করূপে আমরা মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই। ইহাও বাষ্পসমষ্টি, তথাপি আলোকমণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল নয়। পৃথিবী থেকে এই মণ্ডলকে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। আলোকমণ্ডলের উপর অপর একটি বাষ্পস্তর রয়েছে—তার নাম ছটামণ্ডল (Corona) ( ১২ নং চিত্র )। আলোকমণ্ডলের উজ্জ্বলতার জন্য ছটামণ্ডলটিকে সাধারণতঃ দেখা যায় না। সূর্য্যগ্রহণের সময় কিছুক্ষণের জন্য সূর্য্য আবরিত হয়, তখন এই সৌরছটা দৃষ্টি-গোচর হয়।

সৌরছটায় নানা রং দেখা যায়। সূর্য্যাস্তে ও সূর্য্যোদয়ে আলোর প্রখরতা কম থাকায় ছটামণ্ডলের বিচিত্রবর্ণ পূর্ব্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে পতিত হ'য়ে আকাশকে নানাবর্ণে রঞ্জিত করে' তোলে। ছটামণ্ডলের বাষ্পের রং প্রধানতঃ লাল।

ত্রিকোণ কাঁচখণ্ডের ভিতর দিয়ে সূর্য্যালোক বিশ্লেষিত হ'লে তা' নানা বর্ণের আলোকে পরিণত হয়। পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা জান্‌তে পেরেছেন, পৃথিবীর কোন্ উপাদান কি প্রকার আলোক বিকীরণ করে। সূর্য্যমণ্ডলের আলোক এইরূপে বিশ্লেষণ ক'রে, তাঁরা বলেন সূর্য্যে লৌহ, টিন, দস্তা, রৌপ্য, ক্যালসিয়ম, হাই-ড্রোজেন ও হিলিয়ম গ্যাস ত আছেই, তা'ছাড়া আরও কতকগুলি উপাদান আছে যা পৃথিবীতে নাই।
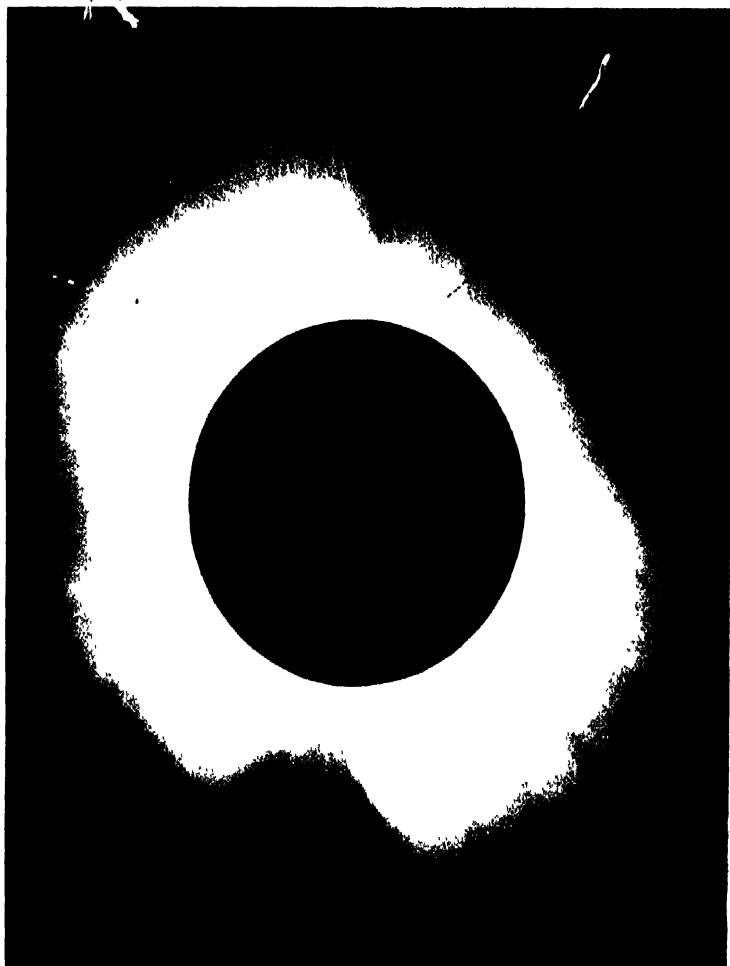
চিত্র—সূর্যের ছটামণ্ডল

## সৌরকলঙ্ক

শিশুকাল হ'তে চন্দ্রকলঙ্কের কথা আমরা জানি। দূরবীক্ষণ আমাদের সৌরকলঙ্কেরও সন্ধান দিয়েছে। ইহারা এক একটি এত বৃহৎ থাকে যে, কেবল কালিমাখান কাঁচের মধ্য দিয়েও কলঙ্কগুলি দেখা যায়।

সৌরকলঙ্কগুলি চিরস্থায়ী নয়। এক একটী কলঙ্ক পাঁচ ছয় দিন থেকে আরম্ভ করে মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত থাকে—তারপর লুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়।
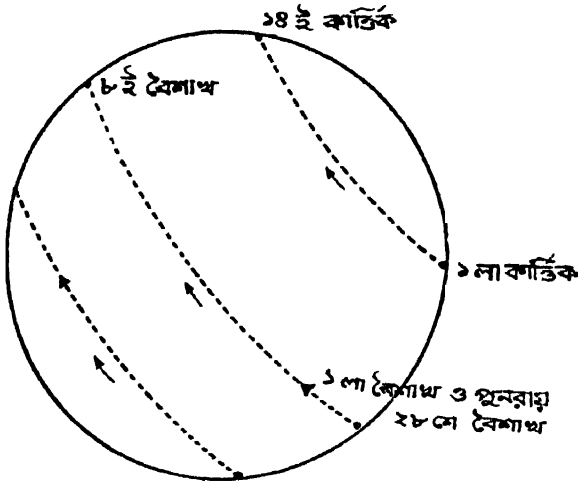
১৩নং চিত্র—সৌরকলঙ্কের গতি

কলঙ্কগুলির একটি গতি আছে। অধিককালস্থায়ী কলঙ্কগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রতি কলঙ্ক সূর্য্যের একপ্রান্ত থেকে অপর

প্রান্তে যায় ১৩½ দিনে, তারপরে সূর্য্যমণ্ডলের অন্যপাশে গিয়ে অদৃশ্য হয়। পুনরায় ১৩½ দিন পরে ইহা আমাদের দৃষ্টিপথে আসে, যদি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত না হ'য়ে থাকে (১৩নং চিত্র)। এর থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি মস্ত বড় কথা জানতে পারা গেছে যে, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যও স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর ২৭ দিনে একবার আবর্ত্তন করে।

আমরা ২৭ দিনে সূর্য্যকে একবার আবর্ত্তন করতে দেখি, কিন্তু ইহার আবর্ত্তনকাল ২৭ দিন নয়, ২৫½ দিন। পৃথিবী ইতিমধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ায় আবর্ত্তনকাল আমাদের কাছে ২৭ দিন হ'য়ে পড়ে।

মাঝে মাঝে সূর্য্যমণ্ডলে অনেকগুলি কলঙ্ক দেখা যায়, মাঝে মাঝে খুব কম। প্রতি ১১ বৎসর অন্তর ইহাদের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি পাওয়ার পরে ৫।৬ বৎসর ধরে কলঙ্কের সংখ্যা হ্রাস পায়, তারপর আবার ৫।৬ বৎসর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইহার কারণ এখনও জানা যায় নাই।

এখন দেখা যাক্, সৌরকলঙ্কগুলি কি। যখন আকাশ মেঘে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা, কোথাও কোন ফাঁক নেই, তখন মেঘলোকের ওপারের কারো দৃষ্টি মেঘের জন্য পৃথিবীতে পৌছিবে না। এমন সময়ে ঝড় উঠে যদি মেঘ স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন হয়, তবে ছিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে উর্দ্ধলোকের অধিবাসী পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্যামল অংশ দেখ্‌তে পাবে। সৌরকলঙ্কগুলিও ঠিক এই প্রকার। অত্যুজ্জ্বল আলোকমণ্ডল মেঘের মতই স্তরীভূত। তারই নীচে সূর্য্যের কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল—ইহা পূর্ব্বে বলেছি। সূর্য্যে যখন এত প্রচণ্ড তাপ,

তখন সেখানে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা ঝড় বয়ে' চলেছে। সেই ঝড় আলোকমণ্ডলের স্তরটিকে স্থানে স্থানে ছিন্ন করে ব'লে, তার ভিতর
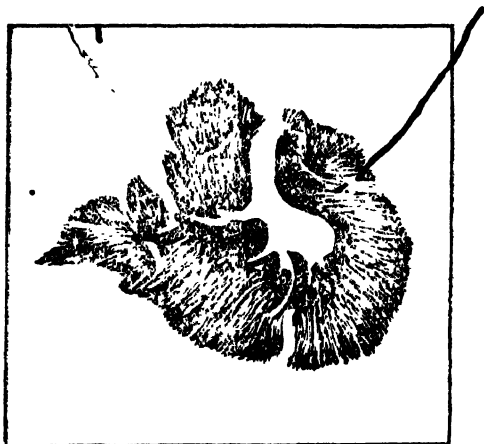
১৪ নং চিত্র—সৌরকলঙ্ক

দিয়ে সূর্য্যের কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলকে আমরা কলঙ্কের ন্যায় দেখি (১৪নং চিত্র)। পৃথিবীর আকাশে মেঘ ছিন্ন হয় অল্পক্ষণের জন্য, সূর্য্যাকাশের ভীষণ ঝড়ে তা' অনেক সময় মাসাধিককালও থাকে।

সাধারণতঃ সৌবকলঙ্কের সন্নিকটবর্ত্তী বাষ্প সূর্য্যের বহির্ভাগের বাষ্প অপেক্ষা উজ্জ্বল।

## সূর্য্যগ্রহণ

গ্রহণের অর্থ গ্রস্ত বা আবরিত হওয়া,—ইতিপূর্ব্বে চন্দ্রগ্রহণে তা' বলা হয়েছে। এইরূপ সূর্য্যও যেদিন আবরিত হয়, সেদিন সূর্য্যগ্রহণ হয়।

চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্যগ্রহণ অধিকতর বিস্ময়কর। দিবসে সূর্য্যালোকে চারিদিক উজ্জ্বল, কোথাও হয়ত মেঘের চিহ্নমাত্র নাই, এমন সময় একটি কালো গোলাকার পদার্থ এসে ধীরে ধীরে সূর্য্যমণ্ডলকে আবৃত করল। দ্বিপ্রহরে পৃথিবীতে অন্ধকার হ'ল সন্ধ্যাকালের মত। চতুর্দ্দিক্ শঙ্খঘণ্টারবে মুখর হ'ল, পুণ্যকামী নরনারী নদীজলে নেমে জপ তপ আরম্ভ করে' দিল, বৈজ্ঞানিক তার দূরবীক্ষণের মুখ ফিরিয়ে দিল সূর্য্যের দিকে। কিছুক্ষণ পরে কালো বস্তুটি ধীরে ধীরে অপসৃত হ'য়ে সূর্য্যকে মুক্তি দিল, তখন আবার সূর্য্যালোকে সব উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্ল।

কালো বস্তুটি সশরীরে চন্দ্র, এবারে আর ছায়া নয়। চন্দ্রগ্রহণে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখে, চন্দ্রের নিজের কোন আলো নেই বলে'। সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়, তাকে কোন ছায়া দ্বারা আবরিত করা যায় না। সূর্য্যকে দৃষ্টির অন্তরালে যেতে হ'লে দৃষ্টিপথে কোন স্থূল পদার্থের আগমন প্রয়োজন।

চন্দ্র আপন কক্ষে প্রদক্ষিণ করতে করতে যেদিন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে এসে পড়ে, সেদিন অমাবস্যা তিথি। অমাবস্যার দিন চন্দ্রের অনালোকিত কালো অংশ পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে। কোন কোন অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এক সমতলের একই সরল রেখায় অবস্থান করে, অর্থাৎ চন্দ্র সেদিন রাহু বা কেতু বিন্দুতে আসে। সেদিন আমাদের দৃষ্টি হ'তে সূর্য্যকে চন্দ্র আড়াল করে বা গ্রাস করে। রাহু বা কেতু বিন্দুর সন্নিকটে চন্দ্র না থাক্লে সূর্য্যগ্রহণ হ'তে পারে না, সেজন্য প্রতি অমাবস্যায় গ্রহণ লাগে না।
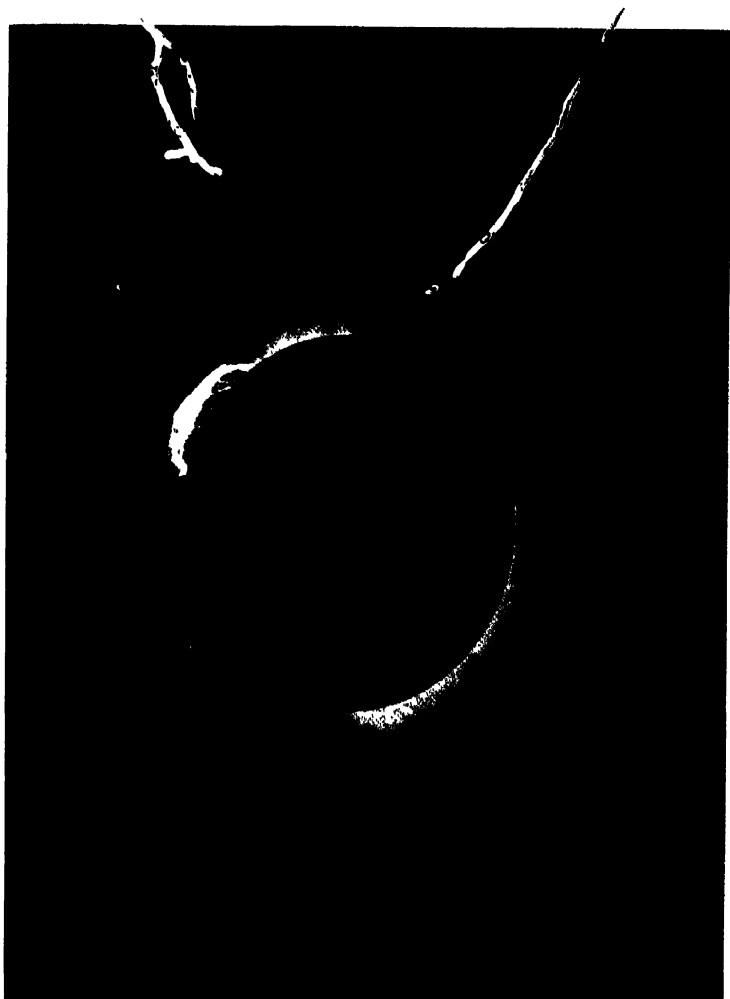
১৬ নং চিত্র—সৌরশিখা।

চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যেরও আংশিক গ্রহণ হ'তে পারে। চন্দ্রের যতটুকু অংশ আমাদের দৃষ্টিপথে থেকে সূর্য্যকে আড়াল করে, সূর্য্যের সেই অংশটুকু আমরা দেখ্‌তে পাই না। ইহা ছাড়া সূর্য্যের বলয়গ্রহণ বা কঙ্কণগ্রহণও হয়। চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলের মাঝখানে থাকে, সূর্য্যের সবটা সেদিন চন্দ্র আবৃত কর্‌তে পারে না; সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরের অংশকে জ্যোতির্ম্ময় বলয়ের ন্যায় চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে দেখা যায়। সূর্য্য আমাদের নিকটে থাক্‌লে তাকে বৃহত্তর এবং দূরে থাক্‌লে ক্ষুদ্রতর দেখি। সূর্য্য যখন নিকটে থাকে, তখন যদি কোনদিন সূর্য্যগ্রহণ হয়, সেদিন চন্দ্র সূর্য্যকে সম্পূর্ণ আড়াল কর্‌তে পারে না বলে' বলয়গ্রাস বা কঙ্কণগ্রাস হয়। বৎসরে পাঁচটি সূর্য্য-গ্রহণ হ'তে পারে। কিন্তু তুইটি হবেই। পূর্ণগ্রহণ সাত মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় না।

১৫ নং চিত্র—সূর্য্যগ্রহণ

চিত্র (১৫) হ'তে বোঝা যাবে, চন্দ্রের ক্ষুদ্রদেহের ছায়া গ্রহণের সময় পৃথিবীর অতি সামান্য অংশেই পড়ে। সেজন্য সূর্য্যগ্রহণ অতি অল্প স্থান থেকেই দেখা যায়। সৌরছটা একমাত্র গ্রহণের সময়েই ভাল করে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাই বৈজ্ঞানিকেরা ছটা-মণ্ডলের তত্ত্ব জানবার অভিপ্রায়ে যে স্থান হ'তে গ্রহণ সুবিধামত

দেখা যাবে, সেখানে সমবেত হন। গ্রহণ লাগা বা স্পর্শের কাল থেকে গ্রহণ ছাড়া বা মোক্ষকাল পর্য্যন্ত মাত্র কয়েক মিনিট সময় হ'লেও, তারই মধ্যে সৌরছটামণ্ডলের কয়েকটি তথ্য তাঁরা অবগত হ'তে পেরেছেন। সূর্য্যমণ্ডলের বাষ্প সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়ছে। এক একটী রক্তবর্ণ শিখাকে অনেক সময় লক্ষ লক্ষ মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আকাশে উত্থিত হ'তে দেখা গেছে (১৬ নং চিত্র)। বিচিত্রবর্ণ-সম্পন্ন ছটামণ্ডলে যে রক্তবর্ণই প্রধান, তাও গ্রহণকালের ছটামণ্ডলের আলোক হ'তেই জানা যায়।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## সৌরজগৎ

### আকাশে পৃথিবী

আকাশ পৃথিবী নিয়ে ভাবনা কবে যে প্রথমে মানুষের মাথায় প্রবেশ করেছে, তা আমাদের জানা নেই। তার বুদ্ধির উন্মেষ হবার পর সে তার দৃশ্যমান উদ্ভিদ্ ও প্রাণিপূর্ণ রাজ্যের নাম দিল পৃথিবী, জ্যোতিষ্কসমন্বিত নীল চন্দ্রাতপের নাম দিল আকাশ; দিগন্তরেখায় পৃথিবী শেষ হ'য়ে আকাশ আরম্ভ হয়েছে। পৃথিবীর আকার সমতলের ন্যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা মানবের বাসের জন্য কোন্ এক বিরাটাকার দৈত্যের মাথার খুলি নিয়ে তার ভিতরের দিকে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে' দিয়েছেন। মানুষের অন্ধকার দূর করবার জন্যই জ্যোতিষ্কমণ্ডল তাঁর আদেশে আকাশে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে।

১৮ নং চিত্র - হিন্দুপুরাণের জগৎ

ক্রমে আহার্য্যের অন্বেষণে মানুষকে জন্মভূমি হ'তে দূরদেশে যেতে হ'ল। সে দেখ্‌ল, সে যত হাঁটে, পথ আর ফুরায় না, আকাশের সীমানাও আর পাওয়া যায় না। তাই সে মনে কর্‌ল, পৃথিবী একটি অসীম প্রান্তর, আকাশও অসীম।

মানুষের প্রয়োজন বেড়ে চল্‌ল দিনের পর দিন। সে তার সঞ্চিত বাহুল্যবস্তুর পরিবর্ত্তে অন্যের নিকট হ'তে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ কর্‌তে লাগ্‌ল। এইরূপে বাণিজ্যের সুরু হয়। বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অনেক দূরদেশে যাবার চেষ্টায় বাধা দিতে লাগ্‌ল সমুদ্র, ভেলা বা নৌকা দিয়েও যাকে পাড়ি দেওয়া গেল না। তাই তার মনে পৃথিবীর এই চিত্র অঙ্কিত হ'ল যে, পৃথিবী অসীম সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, যার ঊর্দ্ধদিকে আকাশ অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত। সেকালের পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক গল্পই এই ধারণাকে ভিত্তি ক'রে রচিত।

ভারতে পুরাকালে মানুষের বিশ্বাস ছিল, অসীমসমুদ্রজলে বিধাতা একটি কূর্ম্মরূপে ভাসমান, তাঁর পৃষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে চারিটি দিক্‌হস্তী দন্তদ্বারা পৃথিবীকে ধারণ ক'রে রয়েছে। উপরে আকাশে আছে সুমেরুপর্ব্বত, যাকে সূর্য্যদেব ও চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন। সূর্য্য সুমেরুর সম্মুখে থাক্‌লে পৃথিবী তার আলোক পায়, পশ্চাতে থাক্‌লে সুমেরুর ছায়ায় পৃথিবীতে রাত্রি হয় (১৮নং চিত্র)। ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সুমেরুশিখরের নিকটে একটি অপূর্ব্বরাজ্যে বাস করেন, যার নাম স্বর্গলোক এবং যে রাজ্য পুণ্যশীল মানবের মৃত্যুর পরের আবাসভূমি। পৃথিবীর মহাপুরুষগণ জীবনের শেষে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আকাশে বিরাজিত থাকেন। রাজপুত্র ধ্রুবের ভক্তিতে

মুগ্ধ হ'য়ে বিধাতা তাকে সকল নক্ষত্রের কেন্দ্রে স্থাপন করেন, তার দিকে লক্ষ্য রেখে অন্য সকল নক্ষত্র পূর্ব্বাকাশ হ'তে পশ্চিমাকাশে ভ্রমণ করে : আর একটি গল্পে আছে যে, ভগবান্ কূর্ম্মরূপে না থেকে অনন্তনাগরূপে তাঁর সহস্রফণার একটি ফণায় পৃথিবীকে ধারণ করে থাকেন। পরিশ্রান্ত হলে অপর একটি ফণার উপর পৃথিবীকে স্থাপন করেন, যেজন্য ভূমিকম্প হয়।

প্রাচীন গ্রীকদেরও পৃথিবী সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা ছিল। তারা ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী গ্রীসদেশকে ভূপৃষ্ঠের কেন্দ্র মনে কর্‌ত। সুদূরে দেবাধিষ্ঠান উচ্চ অলিম্পাস পর্ব্বতে দেবতারা মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করেন। দেবরাজ জুপিটারের আদেশে সূর্য্যদেবতা এপোলো দিবসে ও চন্দ্রদেবতা ডায়েনা রাত্রিকালে আকাশে একবার পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণশেষে বিশ্রামের জন্য পশ্চিমসাগরে ডুব দেন। এখন কথা হচ্ছে যে, জ্যোতিষ্কগণ পশ্চিমাকাশে ত অস্ত যায়, কি করে আবার দ্বাদশ ঘণ্টা পরে পূর্ব্বাচলে উদিত হয়! মিশরীয় পুরাণ তারও একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে। সূর্য্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণ পশ্চিমপ্রান্তে উপস্থিত হ'লে পৃথিবীর নিম্নে শায়িত পৃথ্বীদেব তাঁর বিশাল হস্ত দ্বারা তাদের পূর্ব্বপ্রান্তে সরিয়ে দেন। তারপর তারা আবার আকাশে অন্তরীক্ষদেবীর পৃষ্ঠের উপর বিচরণ করে।

পুরাণে যাই বলুক, পণ্ডিত কারো মত প্রমাণাভাবে গ্রহণ করে না, তাই ক্রমশঃ মত পরিবর্ত্তিত হ'ল। কূর্ম্ম প্রভৃতি পৃথিবীর আধার হ'লে কূর্ম্মেরও আধার প্রয়োজন, এইরূপে একটি আধার কল্পনা কর্‌তে গিয়ে অনন্ত আধারের কল্পনা কর্‌তে হয়, তাতে

পৃথিবীর ব্যাখ্যা আরো জটিল হ'য়ে পড়ে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেই প্রাচ্যের পণ্ডিতমণ্ডলীর ধারণা হয় যে, পৃথিবী একটি নিরাধার, অসীম ও স্থির গোলক, সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রসমন্বিত নভোমণ্ডল চব্বিশ
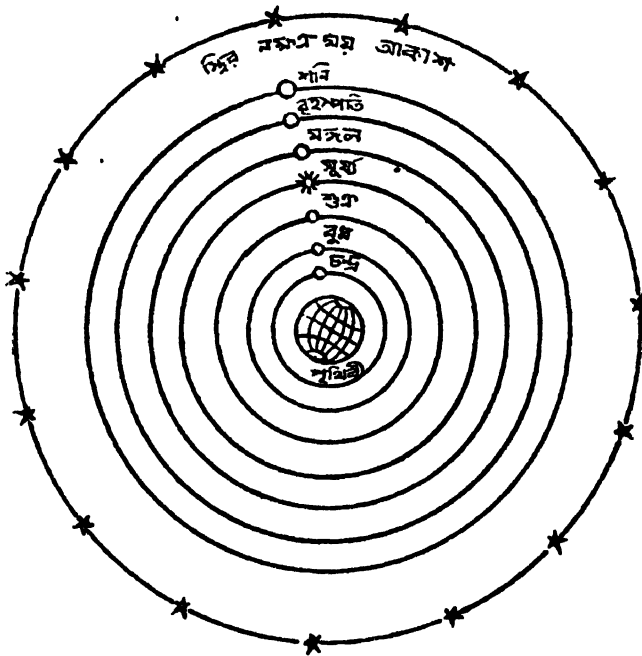
১৯ নং চিত্র—টলেমীর সৌরজগৎ

ঘণ্টায় ইহাকে একবার প্রদক্ষিণ করে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিশর দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্ টলেমী প্রাচ্যের জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংগৃহীত করে' গ্রীসদেশে প্রচার করেন। আকাশের যে চিত্র তিনি দিলেন, তার কেন্দ্রে রইল স্থির পৃথিবী, পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী হ'ল

চন্দ্র, তারপরে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও তারপরে নক্ষত্রগণ, সকলেই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে ( ১৯ নং চিত্র )।

ইতিমধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসদেশে নিসেটাস্ ও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট পৃথিবীর মেরু অব-
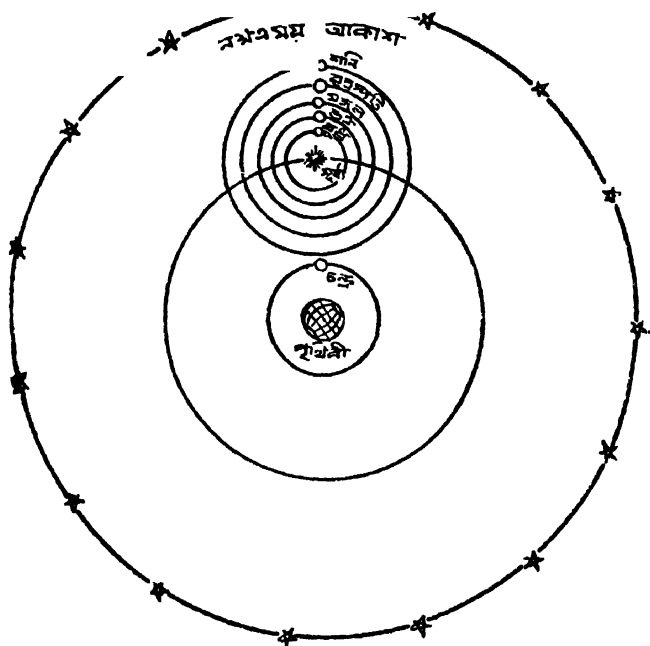
২০ নং চিত্র—টাইকো ব্রাহের সৌরজগৎ

লম্বনে আবর্ত্তনের কথা বলেন। কিন্তু তখনকার দিনে উপযুক্ত প্রমাণ দেবার সুযোগ হয়নি, তাই এ মত তখন কোথাও স্থান

পেল না। টলেমীর মতও পণ্ডিতমহল ভিন্ন কেহ গ্রাহ্য করেনি পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত।

এর পরে টাইকো ব্রাহে পণ্ডিতমহলে প্রমাণ করলেন যে, সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করছে বটে, কিন্তু সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি ( ২০নং চিত্র )।
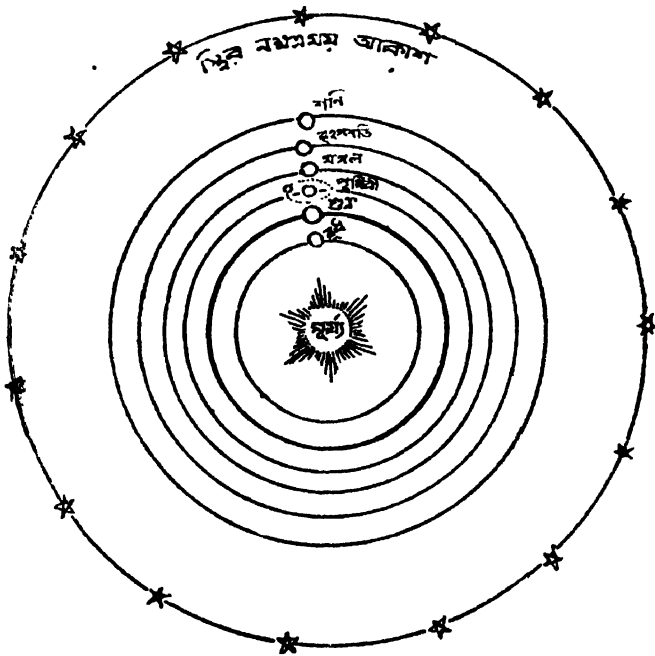
২১ নং চিত্র—কোপানিকাসের সৌরজগৎ

এই ধারণা অনুসারে গণনা করলেও গ্রহ উপগ্রহদের গতির হিসাব নির্ভুল হ'তে পারে, সেজন্য পণ্ডিতেরা এ মত অগ্রাহ্য করেন নি।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোপার্ণিকাস্ দ্বারা জ্যোতিষ্কদের গতি সম্বন্ধে অন্য প্রকার মত প্রমাণিত হয়েছিল।
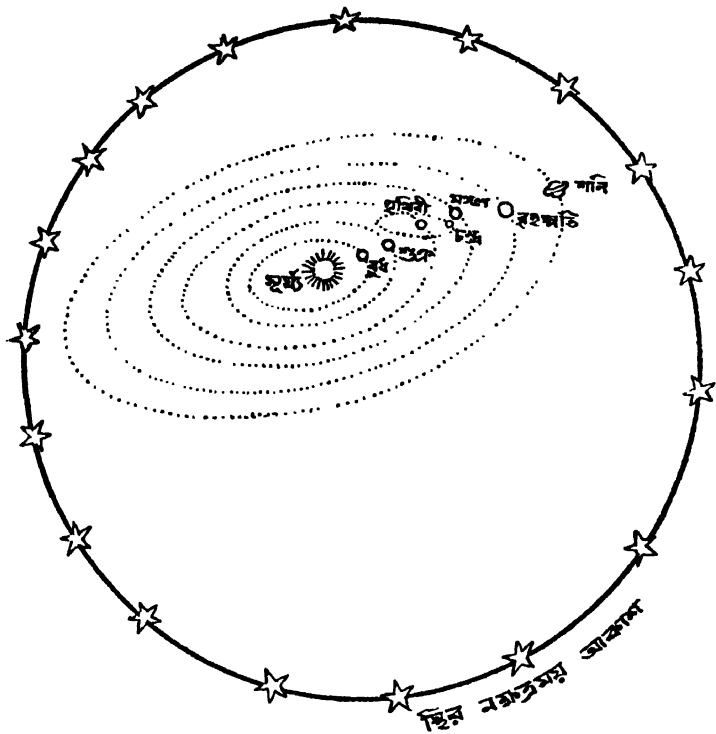
২২ নং চিত্র—কেপ্‌লারের সৌরজগৎ

তাঁর মতে সৌরজগতের কেন্দ্রে আছে স্থির সূর্য্য, পৃথিবী তার সম্মুখে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তন করে। চন্দ্র, পৃথিবী ও গ্রহগণ তাকে আপন আপন কক্ষবৃত্তে নিয়মিত গতিতে প্রদক্ষিণ

করে, এবং নক্ষত্রগণ সুদূর গগনপ্রান্তে সূর্য্যের ন্যায় স্থির ভাবে অবস্থিত ( ২১নং চিত্র )। আকাশে পৃথিবীর অবস্থিতির ধারণা প্রায় নির্ভুল হ'য়ে এল।

এর পরে টাইকো ব্রাহের শিষ্য কেপ্‌লারের জন্য শুধু এই প্রমাণ করাই বাকী রইল যে, পৃথিবী প্রভৃতির কক্ষ ঠিক বৃত্ত নয়, বৃত্তাভাস। বৃত্তাভাসের কেন্দ্রদ্বয়ের একটিতে থাকে সূর্য্য, আর যখন কক্ষপথে গ্রহগণ সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকে, তাদের গতিবেগ তখন ঈষৎ বৃদ্ধি পায় ( ২২নং চিত্র )।

এইরূপে পৃথিবী ও গ্রহ উপগ্রহের আকাশে অবস্থিতির সঠিক ধারণা করতে মানুষের হাজার কয়েক বৎসর কেটে গেছে।

## সৌরপরিবার

আমরা জানি, পৃথিবী চন্দ্রকে নিয়ে সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করে। পৃথিবী সূর্য্যের একটি গ্রহ, পৃথিবীর ন্যায় আরো আটটি গ্রহ তাদের উপগ্রহসমেত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যের নিকট-বর্ত্তী গ্রহের নাম বুধ, তারপর যথাক্রমে শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেণাস্, নেপচুন্ ও প্লুটো। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটি গ্রহ ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গেছে। তাদের মিলিতভাবে এস্‌টার-অয়েড্‌স্ বলে। ( ২৩ নং চিত্র )

গ্রহ উপগ্রহ ভিন্ন সূর্য্যপরিবারে আরো জ্যোতিষ্ক আছে—তারা ধূমকেতু ও উল্কা। ধূমকেতুগণ একটি আলোকপুচ্ছ নিয়ে বহুদিনে তাদের সুদীর্ঘ কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, কতকগুলি আবার

একবার প্রদক্ষিণ করেই চিরকালের মত অন্তর্হিত হয়। উল্কাপিণ্ড-গুলি নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন, ভ্রমণকালে ইহারা কোন গ্রহের সম্মুখীন হ'লে সাধারণতঃ গ্রহটি তাদের আপন পৃষ্ঠের দিকে আকর্ষণ করে
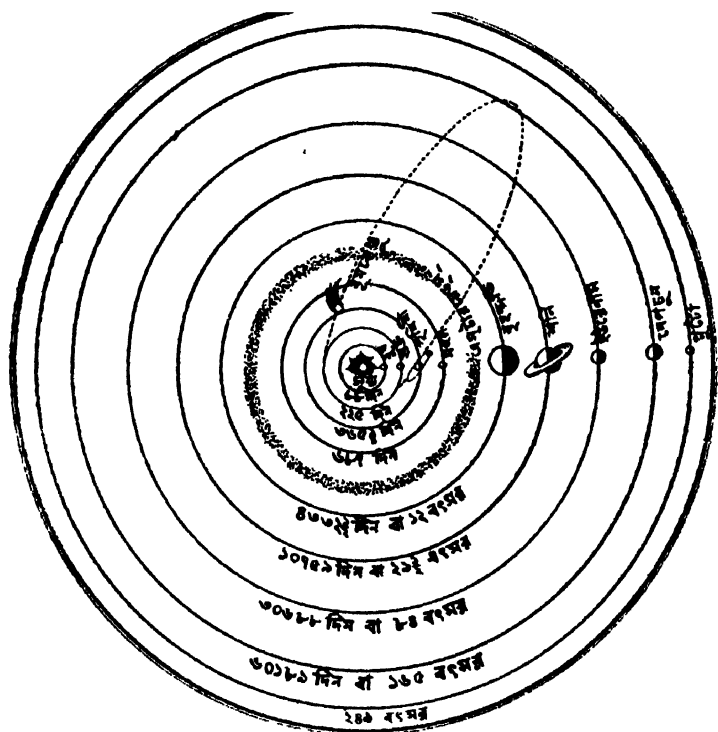
২৩ নং চিত্র—সৌরজগৎ

নেয়। উল্কাপিণ্ড, ধূমকেতু, উপগ্রহ, নবগ্রহ ও সূর্য্যকে নিয়ে সৌর-জগৎ। সৌরজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা সূর্য্য।

## বুধ ( Mercury )

বুধ সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ, তাই আমরা আকাশে ইহাকে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে দেখি। ইহা যখন সূর্য্যের পশ্চিমদিকে থাকে, তখন সূর্য্যোদয়ের কিছু আগে পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়, আবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। যখন সূর্য্যের পূর্ব্বে থাকে, তখন সূর্য্যাস্তের পর অল্পক্ষণের জন্য ইহাকে দেখা যায়। কখনও সূর্য্যমণ্ডলের সম্মুখীন হয়, তখন দূরবীক্ষণ দ্বারা বুধকে সূর্য্যের গায়ে একটি গোল কলঙ্কের মত দেখায়, আবার কখনও সূর্য্যের বিপরীতে গিয়ে আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হয়। যখন দেখা যায়, তখন ইহাকে আমরা পীতাভ একটি সাধারণ নক্ষত্রের ন্যায় দেখি। গ্রহগুলির মধ্যে বুধ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহার ব্যাস প্রায় ৩,০০০ মাইল।

দূরবীক্ষণ দ্বারা বুধে পর্ব্বতমালার অবস্থানের কথা জানা যায়। সম্ভবতঃ সেখানে জল ও বায়ু নাই। বায়ুমণ্ডল কোনকালে থাকলেও অতিরিক্ত উত্তাপে এতদিনে তার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। সূর্য্যের সন্নিকটে থাকার জন্য বুধে প্রচণ্ড উত্তাপ। কোন প্রাণী সেখানে বাস করে কি না, তা আমরা জানি না।

বুধ ৮৮ দিনে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে স্বীয় মেরুর উপর একবার আবর্ত্তন করে। সেজন্য ইহারও একার্দ্ধ সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে ফিরান থাকে—পৃথিবীর দিকে চন্দ্রের ন্যায়। তার ফলে বুধের এক অর্দ্ধাংশে চিরকাল দিন, অপরার্দ্ধে চিররাত্রি। মাত্র ৮৮ দিনে বৎসর বলে' বুধে ঋতুপরিবর্ত্তন খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়।

বুধের বৃত্তাভাস কক্ষ পৃথিবীর মত প্রায় বৃত্তাকার নয়, সেজন্য ইহা সূর্য্য হ'তে কখনও ৩ কোটি মাইল দূরে, কখনও বা ৪ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে থাকে। বুধের গতির অস্থিরতা লক্ষ্য ক'রে কোন কোন পণ্ডিত সূর্য্যের আরও নিকটে ভল্‌কান্ (Vulcan) নামক অপর একটি গ্রহের অবস্থান অনুমান করেন। কোন এক বৎসরে সূর্য্যগ্রহণের সময় দূরবীক্ষণ দ্বারা তাকে না কি দেখাও গেছে।

চন্দ্রকলার ন্যায় বুধেরও কলা পৃথিবী হ'তে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তবে চান্দ্রবৎসর ২৯½ দিন হওয়ায় তার শুক্লপক্ষে ১৫ কলা ও কৃষ্ণপক্ষে ১৫ কলা দেখি; বুধের বৎসর ৮৮ দিন হওয়ায় বুধকলার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় ৪৪ দিন ধরে'। অর্থাৎ ইহাকে আমরা ৪৪ আকারে দেখি।

## শুক্র (Venus)

সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে অনেক সময় একটি উজ্জ্বল তারা দেখা যায়—লোকে যাকে সন্ধ্যাতারা বলে থাকে। কিছুদিন পরে তাকে আর দেখা যায় না। আবার দিনকতক পরে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সন্ধ্যাতারার অনুরূপ একটি উজ্জ্বল তারা উদিত হয়, তার নাম শুকতারা। কিন্তু সন্ধ্যাতারাও নক্ষত্র নয়, শুকতারাও না,—এবং ইহারা বিভিন্নও নয়। শুক্র গ্রহকেই আমরা কখনও সন্ধ্যাতারারূপে, কখনও শুকতারারূপে আকাশে দেখ্‌তে পাই।

শুক্রের কক্ষ সূর্য্য হতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। কোন কোন সময়ে শুক্র পৃথিবী হ'তে ২৪,০০০,০০০ মাইলের মধ্যে এসে পড়ে। পৃথিবীর কক্ষ বুধ ও শুক্রের কক্ষসীমার বহির্দ্দেশে থাকায় মানুষ বুধ ও শুক্রকে সূর্য্যসান্নিধ্য ত্যাগ করে' বেশী দূরে যেতে দেখে না। এই দুইটি গ্রহকে পৃথিবীর অন্তঃকক্ষ গ্রহ বলে।

শুক্রের ব্যাস ৭৬০০ মাইল,—প্রায় পৃথিবীর সমান। ইহা ২২৫ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এবং চন্দ্র ও বুধের ন্যায় উহারও আবর্ত্তন ও প্রদক্ষিণকাল সমান। শুক্রগ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে। শুক্র যখন আমাদের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন ইহা আমাদের দৃষ্টিতে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ইহার উজ্জ্বলতা দেখে জান্‌তে পারা যায় যে, শুক্রে জল আছে, এবং সূর্য্যের দারুণ তাপহেতু ইহার বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বদাই মেঘ অবস্থান করে; মেঘে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হওয়ায় শুক্রকে অত উজ্জ্বল দেখায়। পৃথিবীর ন্যায় মানুষ অথবা অন্য কোনপ্রকার প্রাণী শুক্রে বাস করে কি না—তা

এখনও বলা যায় না, তবে কালে ইহা প্রাণীর বাসস্থান হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়।

শুক্রও কলা বিশিষ্ট, অবশ্য দূরবীক্ষণের দৃষ্টিতে। শুক্রের কোন উপগ্রহ নাই।

পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যভাগে যখন শুক্র থাকে, তখন দূরবীক্ষণ দ্বারা আমরা ইহাকে সূর্য্যমণ্ডলে একটি কালো বিন্দুর ন্যায় দেখি। সূর্য্যসম্মুখে শুক্রের এইরূপ অবস্থানকে শুক্রপ্রবেশ বলে। শুক্রের আয়তন যদি আরো অনেক বড় হ'ত, তবে সূর্য্যকে আবরিত করে' দীর্ঘকালব্যাপী সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত করতে পারত। সূর্য্যকে আকাশে কিছুদিন দেখাই যেত না, আবার আংশিক গ্রহণের সময় সূর্য্যকে চন্দ্রের ন্যায় কলাবিশিষ্ট মনে হ'ত।

## মঙ্গল (Mars)

মঙ্গলগ্রহের ইংরাজী নাম মার্স (Mars)। গ্রীকপুরাণে মার্স যুদ্ধের দেবতা। আকাশে গ্রহটি ওঠে একটি লাল নক্ষত্রের মত, যেন সেই দেবতারই রক্তচক্ষু।

বুধ ও শুক্রকে যেমন অন্তঃকক্ষগ্রহ বলে, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্, নেপচুন ও প্লুটো তেমনি বহিঃকক্ষগ্রহ। সূর্য্য হ'তে দূরত্ব হিসাবে পৃথিবীর পরেই মঙ্গলের স্থান, ইহা সূর্য্য হ'তে ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।

মঙ্গল মেরু অবলম্বনে আবর্ত্তন করে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে, সেখানে দিবারাত্রি প্রায় পৃথিবীর সমান। ইহার বৎসর হয় ৬৮৭ দিনে, অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে মঙ্গল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে' আসে। ইহার ব্যাস ৪২০০ মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্দ্ধেক এবং ইহার আয়তন পৃথিবীর সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র।

মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহ আছে, ডীমস্ (Deimos) ও ফোবাস্ (Phobos)। ডীমস্ ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে, ফোবাস্ করে ৭২/৩ ঘণ্টায়। পৃথিবীর মানুষ আকাশে ফোবাস্‌কে দেখ্‌তে পেলে ভারী আশ্চর্য্য হ'ত—ফোবাস্ তার কাছে সুদীর্ঘ আকাশমার্গে ধাবমান্ একটি জ্যোতির্ম্ময় অশ্বের ন্যায় প্রতীয়মান হ'ত। মঙ্গলে যদি কোন অধিবাসী থাকে, সে দেখে তার আকাশে দিনে ৩।৪ বার ফোবাসের উদয়াস্ত ও অনবরত কলা-পরিবর্ত্তন। ডীমস্‌ও প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন সময়ে পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় থাকে, আর গ্রহণ যে কত সংঘটিত হয় তার ত হিসাবই নাই। এক এক সময় ডীমস্ ও ফোবাস বা উভয়েই

আড়াল করে সূর্য্যকে, তখন হয় সূর্য্যগ্রহণ। কখনও মঙ্গলের ছায়া উপগ্রহ দুইটিতে পড়ে' তাদের গ্রহণ হয়, আবার কখনও ডীমস্‌কে আড়াল করে' দাঁড়ায় ফোবাস্‌। এইরূপ সেখানকার আকাশে প্রত্যহই দর্শনীয় কিছু থাকেই।

মঙ্গলে বায়ুমণ্ডল আছে। দূরবীক্ষণে ইহার যে ছবি দেখা যায়, তাতে বৈজ্ঞানিকমহলে সাড়া প'ড়ে গেছে। মঙ্গলের উত্তরাংশে মেরুপ্রদেশে তুষারাবৃত স্থান আছে, তার দক্ষিণে আছে সমুদ্র। সমুদ্রের দক্ষিণ হ'তে প্রায় দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত কৃত্রিম সরল প্রণালীর চিহ্ন পাওয়া যায় (২৪নং চিত্র)। এককালে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছিলেন, কোন প্রাণী না থাক্‌লে এই প্রণালী থাক্‌তে পারে না। আর, হাজার হাজার মাইলব্যাপী অত দীর্ঘ খাল যারা কাট্‌তে পারে, তাদের সভ্যতা যে পৃথিবীর সভ্যতা অপেক্ষা অনেক অধিক অগ্রসর, তাহা সহজেই অনুমেয়। সম্ভবতঃ মঙ্গলের অধিবাসিগণের জলকষ্ট হওয়ায় এই সকল প্রণালী সাগরজলদ্বারা পূর্ণ করে' তারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে। অবশ্য এই সকল অনুমানে আজকাল সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। মঙ্গলের দিন প্রায় পৃথিবীর সমান, সূর্য্য হ'তে ইহার দূরত্বও খুব বেশী নয়—ইহাতে কোন প্রাণী বাস করা অসম্ভব নয়। মঙ্গল পৃথিবীর খুব নিকটেই,—এক এক সময়ে ত পৃথিবী ও মঙ্গলের ব্যবধান থাকে মাত্র ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল। মঙ্গল গ্রহে অধিবাসী আছে আশা করে' পৃথিবীর মানুষ অনেকদিন হ'তেই তাদের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা করছে। বিজ্ঞানের উন্নতির গতি দেখে আশা করা যায়—হয়ত কোনদিন কোন উপায়ে তাদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান চল্‌বে।

১৪ নং চিত্র—মঙ্গল

আকাশ রহস্য [৫০ পৃ

১৫ নং চিত্র—বৃহস্পতি

আকাশ রহস্য [৫৬ পৃঃ

## এস্‌টারয়েড্‌স্‌ (Asteroids) বা গ্রহকণিকা

মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যে এস্‌টারয়েড্‌স্‌-এর কক্ষ। এস্‌-টারয়েড্‌স্‌ কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহসমষ্টি। ইহারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী থাক্‌লেও প্রত্যেকেই বিভিন্ন কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

সাধারণতঃ সকল গ্রহের দূরত্বের একটি ক্রম পাওয়া যায়। বুধ হ'তে শুক্র যত দূরে, শুক্র হ'তে পৃথিবীর দূরত্ব তার চেয়ে একটু বেশী, পৃথিবী হ'তে মঙ্গলের দূরত্ব আর একটু বেশী, এইরূপ। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম খাটে, কেবল মঙ্গল হ'তে বৃহস্পতির দূরত্ব সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না; বৃহস্পতি হঠাৎ যেন বেশী দূরে চলে গেছে। তাই অনুসন্ধান করে দেখা হল, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোন গ্রহ আছে কি না। অনুসন্ধানের ফলে এস্‌টারয়েড্‌স্‌ আবিষ্কৃত হয়। গ্রহগুলির সূর্য্য হ'তে দূরত্বের ধারা গণিত সাহায্যেও বোঝা যায়। নিম্নে কতকগুলি ধারাবাহিক সংখ্যা দেওয়া গেল।

০ ৩ ৬ ১২ ২৪ ৪৮ ৯৬ ১৯২ ৩৮৪

ইহাদের প্রত্যেকের সহিত ৪ যোগ করিলে সংখ্যাগুলি দাঁড়ায় এইরূপ :—

৪ ৭ ১০ ১৬ ২৮ ৫২ ১০০ ১৯৬ ৩৮৮

সূর্য্য হ'তে পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি ২৭ লক্ষ মাইল। এই দূরত্বকে যদি ১০ বলা যায়, তবে বুধের দূরত্ব ৪, শুক্রের ৭, মঙ্গলের ১৬, বৃহস্পতির ৫২, শনির ১০০, এইরূপ হ'বে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে ২৮ সংখ্যার স্থানে কোন গ্রহ দেখা যায় নাই। সেজন্য সেখানে বিশেষ ক'রে অনুসন্ধান চলে। তার ফলে এস্‌টারয়েড্‌স্‌ আবিষ্কৃত

হ'য়েছে। সংখ্যাগুলি বোড্ (Bode) এর আবিষ্কার। দূরত্বের এই ক্রমানুবর্ত্তিতাকে বোড্স্ ল (Bode's Law) বলে।

এস্টারয়েড্স্এ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ রয়েছে,—এ পর্য্যন্ত তিন-শতাধিক গ্রহ আবিষ্কৃত হ'য়েছে। দূরবীক্ষণ ব্যতীত তা'দের কোনটিই আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ সীরিসের ব্যাসই মাত্র ৪৮০ মাইল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, একটি বৃহৎ গ্রহ ভেঙ্গে চুরে এই ক্ষুদ্র গ্রহমণ্ডলের সৃষ্টি হ'য়েছে, কারণ ভাঙ্গার লক্ষণ ইহাদের দেহে বর্ত্তমান। কোন কঠিন পদার্থ ভগ্ন হ'লে তার ভগ্নাংশগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ হয় ও তা'দের কোন বিশিষ্ট আকৃতি থাকে না। এই গ্রহগুলিও সব গোলাকার নয়, ভগ্ন পদার্থের টুক্‌রার মত আকৃতিবিশিষ্ট।

ভেষ্টা (Ve-ta), সীরিস (Ceres) ও পেলাস (Pallas), এস্টার-য়েড্স্-এর প্রধান গ্রহ।

## বৃহস্পতি (Jupiter)

বৃহস্পতি দেবতার গুরু, সর্ব্বোচ্চস্থানে ইহার আসন। গ্রহমণ্ডলীর মধ্যেও বৃহস্পতি আয়তনে এবং উজ্জ্বলতায় সকলকে পরাজিত করে। সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহগুলিকে একত্রিত কর্‌লে যে আয়তন পাওয়া যায়, বৃহস্পতি আয়তনে তার চেয়েও বড়।

আকাশে বৃহস্পতিকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দেখায়। ইহা আকারে পৃথিবীর ১৩০০ গুণ, কিন্তু ওজনে ৩১০ গুণ মাত্র। ইহার ব্যাস ৮৫ হাজার মাইল। সূর্য্য হ'তে বৃহস্পতির দূরত্ব ৪৮ কোটি ২০ লক্ষ মাইল। বৃহস্পতির আবর্ত্তনকাল বা দিনরাত্রির পরিমাণ ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট, এবং কক্ষপথে প্রদক্ষিণকাল ৪৩৩২ দিন, অর্থাৎ প্রায় দ্বাদশ বৎসর। কক্ষবৃত্তে ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর নিকটতম হয়, তখনও তা'দের ব্যবধান থাকে ৩৭ কোটি মাইল।

বৃহস্পতির আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মাত্র। এর থেকে বোঝা যায়, বৃহস্পতি এখনও কঠিন পদার্থে পরিণত হয়নি। বৃহস্পতি সর্ব্বদা মেঘাবৃত থাকে (২৫ নং চিত্র), সেই মেঘের উপর সূর্য্য নিজেকে প্রতিফলিত ক'রে গ্রহটিকে অত উজ্জ্বল ক'রে তোলে।

বৃহস্পতিতে বায়ুমণ্ডল আছে, জলীয় পদার্থও নিশ্চয়ই আছে। তথাপি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ইহা এখনও প্রাণীর বাসোপযোগী হয়নি। কোনদিন পৃথিবীর অবস্থা প্রাপ্ত হ'লে ইহা জীবের বাসযোগ্য হ'তেও পারে।

বৃহস্পতির ১০টি উপগ্রহ আছে, তাদের প্রদক্ষিণকাল ১২ ঘণ্টা হ'তে ১৬ দিন ১৬ ঘণ্টার মধ্যে। এতগুলি উপগ্রহের অস্তোদয়, গ্রহণ প্রভৃতির জন্য বৃহস্পতির আকাশে অত্যন্ত বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা হয়।

বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি হ'তে পেরেছে। প্রথম প্রথম কেউ বিশ্বাসই করত না যে, সূর্য্য আকাশে স্থির হ'য়ে রয়েছে এবং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ তা'কে প্রদক্ষিণ করছে। বাস্তবিকপক্ষে সত্য হ'লেও বিষয়টি ধারণায় আনা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু যখন দূরবীক্ষণে দেখা যায়, বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে, তখন আর অবিশ্বাস থাকে না যে, গ্রহগণও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

তা'ছাড়া, বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এই উপগ্রহ-গুলির জন্য আবিষ্কৃত হ'তে পেরেছে। জ্যোতির্ব্বিদের গণনায় বৃহস্পতির উপগ্রহগুলিতে গ্রহণ লাগার যে সময় নিরূপিত হ'ত, তার বেশ কতক্ষণ পরে গ্রহণ দেখা যেত। এর থেকে জানা গেল, গ্রহণ লাগ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তা' দেখতে পাই না, কিছুক্ষণ পরে দেখি—অর্থাৎ আলোকেরও একটা গতি আছে। হিসাব ক'রে পাওয়া গেল, আলোর গতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। এইজন্য সূর্য্যোদয়মাত্রই তার আলো পৃথিবীতে পৌছায় না, উদয়-কালের আট মিনিট পরে পৃথিবীতে তা'র প্রথম রশ্মিপাত হয়।

২৬ নং চিত্র—শনি

## শনি (Saturn)

আমাদের দেশের লোক শনির প্রকোপকে অত্যন্ত ভয় করে। শনির শাপে নল-দময়ন্তীর দুর্দ্দশা, শ্রীবৎসচিন্তার উপর্য্যুপরি বিপদের কথা আমরা জানি,—শনির প্রকোপ নিবারণের জন্য ঠাকু'মা দিদিমার মাদুলী-কবচ শান্তি স্বস্ত্যয়নও সর্ব্বদাই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু, আসলে শনি তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। দূরবীক্ষণ দ্বারা ইহাকে সৌরজগতের গ্রহগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখায়।

শনি-গোলকের মধ্যভাগে তিনটি জ্যোতির্ম্ময় বলয় ঘিরে থেকে গ্রহটিকে আশ্চর্য্যদর্শন করেছে (২৬ নং চিত্র)। বলয়গুলিকে শনির অঙ্গুরীয় বলে। ইহা ব্যতীত শনিমণ্ডলের বহির্দ্দেশে ৯টি বৃহদায়তন উপগ্রহ আছে। দূরতমটির নাম ফীবি,—তার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর এবং শনির চতুষ্পার্শ্বে একবার ভ্রমণ করে ২১/২ বৎসরে।

শনির বৎসর হয় আমাদের ১০৭৫৯ দিন বা ২৯১/২ বৎসরে। শনির ব্যাস ৭১ হাজার মাইল ও ইহার কক্ষ সূর্য্য হ'তে ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে। শনির দিবারাত্রির পরিমাণ ১০ ঘণ্টা ১০ মিনিট।

আয়তনে গ্রহদের মধ্যে শনির স্থান বৃহস্পতির পরেই। আয়তনে যত বড়ই হোক্, আপেক্ষিক গুরুত্বে পৃথিবীকে পরাজিত করতে সৌরজগতের কেউ পারে না; শনি ত না-ই, বৃহস্পতি-সূর্য্যও না। শনির গুরুত্ব পৃথিবীর আট ভাগের এক ভাগ।

শনির বলয়গুলি জ্যোতিষে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

বলয়গুলি কি হ'তে পারে, তাই নিয়ে পণ্ডিতেরা বহু গবেষণা করেছেন। এই বলয় তিনটি শনির বিষুববৃত্তের সমান্তরালভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু তাদের প্রস্থ নিতান্ত সামান্য। বলয়গুলি ধূলিকণা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড প্রভৃতি লইয়া গঠিত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে রচি (Roche) প্রমাণ করেন যে, একটি উপগ্রহ চূর্ণীকৃত হ'য়ে শনিকে বলয়াকারে ঘিরে রয়েছে।

রচি বলেন যে, একটি গোলক যদি অপর কোন গোলককে প্রদক্ষিণ করে, তবে উভয়ের পৃষ্ঠে জোয়ার ওঠে। সর্ব্বদাই ক্ষুদ্রতরটির দুর্দ্দশা হয় বেশী। জোয়ারের স্রোতের জন্য ক্ষুদ্রটির কক্ষ ছোট হ'তে হ'তে ক্রমশঃ বৃহতের অভিমুখে অগ্রসর হ'তে থাকে। এইরূপে এমন একস্থানে আসে যেখানে এলে উপগ্রহটি আপন দূরত্ব রেখে পথ চল্‌তে পারে না, এবং তার বর্ত্তুলাকার দেহও ভেঙ্গে চুরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হ'য়ে যায়। এই সকল কণা কেন্দ্রীয় গোলকের চতুর্দ্দিকে বলয়ের ন্যায় ঘিরে থাকে। রচি আবিষ্কার করেন যে, প্রদক্ষিণশীল গোলক যদি তার কেন্দ্রীয় গোলকের ব্যাসার্দ্ধের ২·৪৫ গুণ দূরে এসে পড়ে, তা'হলে ক্ষুদ্র গোলকটি ভেঙ্গে গিয়ে ঐ প্রকার বলয়ে রূপান্তরিত হয়। এই সীমাকে রচির সীমানা (Roche's limit) বলা হয়। আমাদের চন্দ্রের ভাগ্যও হয়ত এইরূপ—কোনদিন যদি রচির সীমানার মধ্যে এসে পড়ে, তা'হলে চন্দ্রকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে থাক্‌তে হবে। সকল উপগ্রহেরই ভবিষ্যৎ এইপ্রকার। বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহটির এই রূপান্তর গ্রহণের আর বেশী দেরী নাই—সে এখন বৃহস্পতির ব্যাসার্দ্ধের মাত্র ২·৫৪ গুণ দূরে অবস্থান করে।

# ইউরেণাস্ (Uranus)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্যোতির্ব্বিদ হার্শেল (Herschel) নিজে দূরবীক্ষণ তৈরী করে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি, বর্ণ প্রভৃতি পরীক্ষা করে লিপিবদ্ধ কর্‌ছিলেন। এইরূপে ইউরেণাস্ গ্রহের গতিও তিনি লিপিবদ্ধ করেন। ইউরেণাস্‌কে পূর্ব্বে স্থির নক্ষত্র বলা হ'ত। ঐ লিপি থেকে হার্শেল দেখতে পান যে নক্ষত্রটি স্থির নয়, ভ্রমণশীল। তখনও কিন্তু তাঁর ধারণা যে, তিনি একটি বিচিত্র নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্যই আবিষ্কার কর্‌ছেন। ইহার পর ভাল দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করে' তিনি দেখ্‌লেন যে, নক্ষত্রটিতে গ্রহধর্ম্ম বিদ্যমান, ইহা কলাবিশিষ্ট। অর্থাৎ সূর্য্যালোকে আলোকিত হয়, স্বীয় স্বতন্ত্র আলোক নাই। এইরূপে ইউরেণাস্ গ্রহ আবিষ্কৃত হয়।

ইউরেণাস্ সূর্য্য হ'তে ১৭৮ কোটি ১৯ লক্ষ মাইল দূরে থাকে। ইহার ব্যাস ৩১,৯০০ মাইল, পৃথিবীর চতুর্গুণ। ইহার আহ্নিক গতি সমাপ্ত হয় মাত্র ১০ ঘণ্টা ১২ মিনিটে ও বার্ষিক গতি ৮৪ বৎসরে। আকাশ-পথের এক দ্বাদশাংশে ভ্রমণ কর্‌তে ইউরেণাসের ৭ বৎসর অতিক্রান্ত হ'য়ে যায়। সেজন্যই হার্শেলের পূর্ব্ববর্ত্তন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকে গ্রহ মনে না করে' ভ্রমণশীল নক্ষত্র বলে' ধারণা করেছিলেন।

ইউরেণাসের চারিটি উপগ্রহ। গ্রহের চতুর্দ্দিকে তাদের কক্ষ বৃত্তাভাস নয়,—বৃত্তাকার। তারা আবার সৌরজগতের অন্য সকল জ্যোতিষ্কের ন্যায় পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বে না ঘুরে' পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিম দিকে ঘোরে। এই দুইটি ব্যাপারই সৌরজগতে অভিনব।

## নেপ্‌চুন (Neptune)

নেপ্‌চুন আবিষ্কৃত হয় ইউরেণাস্‌-এরও পরে। ইউরেণাস্‌-এর সন্ধান পাবার পরে দেখা গেল যে, গ্রহটি মাঝে মাঝে কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে যায়। ইউরেণাস্‌-এর ন্যায় বৃহৎ গ্রহকে কেবল বৃহস্পতি ও শনিই আকর্ষণ করে' কক্ষচ্যুত করতে পারে। কিন্তু, ভাল করে' হিসাব করে' জানা গেল, শনি বৃহস্পতি ভিন্ন অপর কোন আকর্ষণও তার কক্ষ-চ্যুতির আর একটি কারণ। তখন জ্যোতির্বিদ্‌গণ ইউরেণাস্‌এর বহির্দ্দেশে অপর একটি গ্রহের অবস্থান অনুমান করেন। অনুমান অনুযায়ী গবেষণার পর দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাঁদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে নেপ্‌চুন গ্রহকে পাওয়া গেল।

নেপ্‌চুন ও ইউরেণাস্‌ আয়তনাদিতে প্রায় সমান। নেপ্‌চুনের ব্যাস ৩৪,৮০০ মাইল। সূর্য্য হ'তে ইহার কক্ষ ২৭৯ কোটি ১৬ লক্ষ মাইল দূরে। সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে নেপ্‌চুনের ১৬৫ বৎসর অতিক্রান্ত হ'য়ে যায়।

নেপ্‌চুনের উপগ্রহ সংখ্যা দুইটি। ইহার একটি উপগ্রহের গতি ও কক্ষ ইউরেণাস্‌-এর উপগ্রহসমূহের অনুরূপ।

## প্লুটো (Pluto)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুইটি গ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত নেপ্‌চুনের বহির্দ্দেশে অপর কোন গ্রহ-সন্নিবেশ কেউ কল্পনা করেনি। প্লুটো তার ক্ষুদ্র দেহ নিয়ে নেপ্‌চুন হ'তে বহুদূরে আত্ম-গোপন করে' ছিল—কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। প্রথমে জ্যোতির্ব্বিদ্ পার্সিভ্যাল লাওয়েল্ (Percival Lowell) নেপ্‌চুনের ওপাশে একটি গ্রহাবস্থান কল্পনা করেন এবং তার ওজন, দূরত্ব প্রভৃতিরও একটি হিসাব দেন। কিছুকাল যাবৎ আকাশময় ইহার অনুসন্ধান চলে। তারপর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে মিঃ টমবাও (Mr. Tombough) ইহাকে আবিষ্কার করেন। তখন দেখা যায় যে, ইহার প্রকৃত ওজন এবং আয়তন প্রভৃতির সহিত লাওয়েলের আনুমানিক ওজনাদির বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। পার্সিভ্যাল লাওয়েল এবং আবিষ্কারকের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে এই নূতন গ্রহটির নাম রাখা হ'ল প্লুটো ( Pluto )।

প্লুটো সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে ২৪৯ বৎসরে। আয়তনে প্লুটো পৃথিবী অপেক্ষা কিছু ছোট। ইহার দূরত্ব সূর্য্য হ'তে পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় ৪০ গুণ। আকাশে প্লুটোর কক্ষবৃত্তটিকে যদি কোন প্রকারে দর্শনযোগ্য করে' তোলা যেত, তাহ'লে সেই বৃত্তরেখাটিই হ'ত সৌরজগতের বর্ত্তমান সীমানা।

## ধূমকেতু

আকাশের গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসূর্য্যের গতির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও তাদের গতিবিধি নিয়মিত, আমাদের চক্ষু তাতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু, ধূমকেতুর সহসা আগমন, তেমনি অতর্কিতে পলায়ন, ইহার অত্যধিক ঔজ্জ্বল্য, বিশাল পুচ্ছ প্রভৃতি আমাদের চমৎকৃত করে। পুরাকাল হ'তে মানুষ ধূমকেতুর দৃশ্যে শঙ্কিত হ'য়ে ইহাকে অমঙ্গলকর্ত্তা, দুর্ঘটনার নিদর্শন প্রভৃতি মনে করে' এসেছে।

অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় ধূমকেতুর শরীর কেবল একটি গোলক নয়। সাধারণতঃ ইহার গোলকের দুই প্রান্ত হ'তে জ্যোতির্ম্ময় অতিদীর্ঘ দুইটি পুচ্ছ দেখা যায়। শিরোভাগের বর্ত্তুলটিই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল মনে হয়, উহাই ধূমকেতুর কেন্দ্র। পুচ্ছ দুইটি মস্তকের দিকে ঘন; ক্রমশঃ বিস্তৃত ও বিরল সন্নিবিষ্ট হ'য়ে বহুদূরে গিয়ে আবার দুইটি একত্র সংযুক্ত হ'য়ে যায়। এক একটি ধূমকেতু আবার বহুপুচ্ছবিশিষ্টও থাকে।

ধূমকেতুগুলি অতি বিরল বাষ্প দ্বারা গঠিত। অতিশয় হাল্কা মেঘ নক্ষত্রদের আবরিত করে' রাখ্‌তে পারে, কিন্তু ধূমকেতুর সর্ব্বাপেক্ষা ঘন অংশের ভিতর দিয়েও সাধারণতঃ নক্ষত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাষ্পের বিরলতার জন্য সূর্য্যরশ্মি বাধা পায় না, তাই ইহার সর্ব্বাঙ্গই সর্ব্বদা আলোকিত থাকে। এ কারণে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে যেরূপ কলা দেখা যায়, ধূমকেতুর সেরূপ কলা নাই। যখন ইহা সূর্য্যের সম্মুখীন হয়, তখনই কেবল আমরা ইহাকে দেখ্‌তে পাই।

ধূমকেতুর পুচ্ছ কি করে হ'ল এই সম্বন্ধে সকলেরই কৌতূহল

১৭ নং চিত্র—ধূমকেতু

আকাশ রহস্য ৬১ পৃঃ

হওয়া স্বাভাবিক। ধূমকেতুর শরীর বাষ্পীয় উপাদানে গঠিত—যখন সূর্য্যের একান্ত নিকটে আসে, অত্যধিক সূর্য্যতাপে তখন ইহার বাষ্প উত্তপ্ত হ'য়ে পড়ে। এই বাষ্পরাশি সূর্য্যকিরণে ইহার দেহ হ'তে বেরিয়ে পড়ে, ইহাকেই আমরা ধূমকেতুর পুচ্ছাকারে দেখি। ধূমকেতুর পুচ্ছ সর্ব্বদা সূর্য্যের ঠিক বিপরীতমুখী থাকে। পুচ্ছগুলি অনেক সময় লক্ষাধিক মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু পুচ্ছের বাষ্প এত বিরল যে, কোন উপগ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষ হ'লেও তার কোন ক্ষতিই করতে পারে না।

আমাদের পৃথিবীকে যখন কোন পুচ্ছ স্পর্শ করে যায়, আমরা তা জানতেও পারি না। অত্যন্ত দীর্ঘ পুচ্ছেরও ওজন আধসের তিন পোয়া মাত্র।

ধূমকেতু সূর্য্য হ'তে দূরবর্ত্তী হ'য়ে পড়লে তার পুচ্ছ আর থাকে না। সূর্য্যের যত নিকটবর্ত্তী হয়, ততই ইহার পুচ্ছ দীর্ঘতর ও উজ্জ্বলতর হয় (২৭ নং চিত্র)। সূর্য্য হ'তে পুনরায় যখন দূরে চলে যায় তখন আর ঐ বাষ্পপূর্ণ পুচ্ছকে গুটিয়ে নিয়ে যেতে পারে না—পথেই ফেলে যেতে হয়। এই ছিন্ন পুচ্ছগুলি ঘনীভূত হ'য়ে সৌরজগতে ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকে। যে ধূমকেতুগুলি কেবলমাত্র দূরবীক্ষণ দ্বারা দর্শনযোগ্য, সেগুলির সাধারণতঃ পুচ্ছ থাকে না।

প্লুটোর কক্ষবৃত্তটি সৌরজগতের সীমানা, ধূমকেতুগুলি সাধারণতঃ এই সীমা ছাড়িয়ে চলে যায়। কয়েকটি ফিরেও আসে, কিন্তু অধিকাংশই আর ফেরে না। ইহারা অসীম আকাশের অন্য কোন প্রান্তের অধিবাসী,—পথে যেতে যেতে যখন সৌররাজ্যের মধ্যে এসে

পড়ে, সূর্য্য তখন তাকে আপনার দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। আকর্ষণ-প্রভাবে ধূমকেতু সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে'ই পুনরায় আপন গন্তব্যপথে চলে যায়। কতকগুলি আবার সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণে পরাজিত হ'য়ে চিরকালের মত সূর্য্যের বশ্যতা স্বীকার করে' সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। যে সকল ধূমকেতু সূর্য্যের হাত থেকে কোনরকমে নিষ্কৃতি লাভ করে' পলায়নের চেষ্টা করে, তাদের কোনটির সঙ্গে যদি পথে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেণাস বা নেপ্‌চুণের সাক্ষাৎ হ'য়ে যায়, তারা অমনি তার বহির্ম্মুখী পথ রুদ্ধ করে' দেয়। সূর্য্য তখন তার প্রবল আকর্ষণে ধূমকেতুটিকে সৌরজগতের মধ্যেই চিরকালের জন্য বন্দী করে' রাখে। ধূমকেতুকে আমাদের আকাশে দেখা গেলেও ইহারা সূর্য্যদেহ হ'তে সৃষ্ট বা সৌরজগতের অধিবাসী নয়। ইহারা আমাদের জগতে আগন্তুক মাত্র। আগন্তুক হলেও অবশ্য কোন কোনটি সূর্য্যের সহিত চিরসম্বন্ধে আবদ্ধ হ'য়ে সৌরজগতের অধিবাসী হ'য়ে যায়।

ধূমকেতুর কক্ষ বৃত্তাভাস (Ellipse), পরবলয় (Parabola) বা হাইপারবলয় (Hyperbola) এর আকৃতির ন্যায় হ'য়ে থাকে (২৮ নং চিত্র)। যেগুলির কক্ষ বৃত্তাভাস, কেবল সেইগুলিই প্রত্যাবর্ত্তন করে, অপরগুলি আর ফিরে আসে না। কতকগুলি হয়ত পথেই নিঃশেষিত হ'য়ে অণুপরমাণুতে রূপান্তরিত হয়, কতকগুলি আবার ঘুরতে ঘুরতে আকাশের কোন সুদূর প্রান্তে চ'লে যায়—তার জীবনে হয়ত সূর্য্যের সঙ্গে আর কোনদিন দেখাও হয় না।

যে সকল ধূমকেতু ফিরে আসে, তাদের প্রদক্ষিণকাল ৩.৩ বৎসর হ'তে আরম্ভ করে শত, সহস্র বৎসরও হ'তে পারে। কোন

২৮ নং চিত্র—ধূমকেতুর কক্ষ ও পুচ্ছ
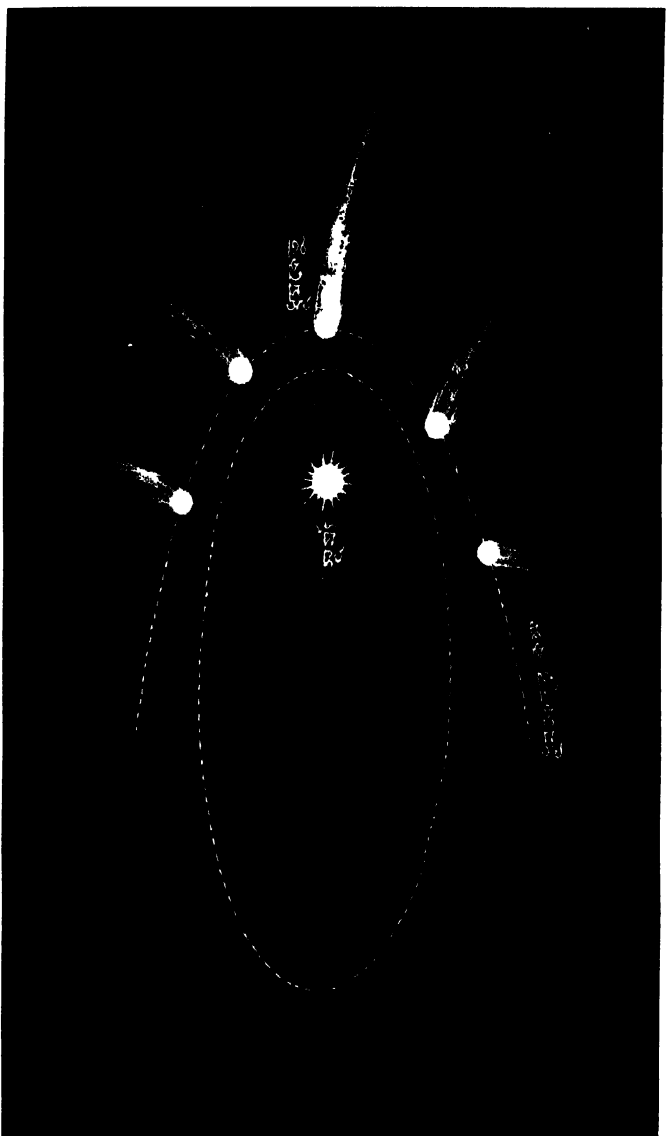
ধূমকেতুর প্রত্যাবর্ত্তনকাল শতবর্ষের কম হ'লে তাকে অচিরাবর্ত্ত ধূমকেতু বলা হয়। হ্যালির (Halley) ধূমকেতু ছিয়াত্তর বৎসরান্তে একবার করে' আকাশে উদিত হয়। তাকে আমরা ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শেষ দেখেছি,—আবার দেখা যাবে ১৯৮৬তে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুটির একবার সম্পূর্ণ ভ্রমণকাল না কি লক্ষ বৎসর।

অষ্ট্রেলিয়াবাসী ব্যায়েলা একটি ধূমকেতুর গতিবিধি সম্বন্ধে গণনা করে' জান্‌তে পারেন, উহার ভ্রমণকাল ৬২/৩ বৎসর। তদনুসারে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তা'কে আকাশে দেখা যায়। পুনর্ব্বার ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সে সূর্য্যের সম্মুখে এল, কিন্তু অদ্ভুত আকৃতি নিয়ে; কতকটা মোচার মত দেখ্‌তে এবং পুচ্ছবিহীন। ২।১ দিনের মধ্যেই উহা দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে দুইটি বিভিন্ন ধূমকেতুতে পরিণত হ'য়ে গেল। ইহার পর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে আকাশে দেখা গেল একটি ধূমকেতুকে, অপরটি তখন বহুদূরবর্ত্তী হ'য়ে পড়েছে। পরের বারে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আর তাকে দেখা গেল না—কক্ষপথে ইতিমধ্যে সে নিঃশেষিত হ'য়ে বিলুপ্ত হয়েছে।

ব্যায়েলার ধূমকেতুর কক্ষপথের স্থানে স্থানে বাষ্প ঘনীভূত অবস্থায় এখনও আছে—কতকগুলি উল্কাপাত হ'তে আমরা তা জানতে পারি।

## উল্কা (Meteor)

প্রতিরাত্রেই আকাশের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে দেখা যায়, একটি নক্ষত্র যেন হঠাৎ ছুটে গেল। আমরা তখন মনে করি যে, নক্ষত্রটি বুঝি স্থান পরিবর্ত্তন করল। আসলে ঐগুলি কোন নক্ষত্রের স্থানপরিবর্ত্তন নয়, উহা উল্কাপাত। কতকগুলি উল্কা আবার পৃথিবীতেও এসে পড়ে।

এখন দেখা যাক্, উল্কাগুলি কি এবং কোথা হ'তে আসে।

সৌরজগতে নানা গ্রহ উপগ্রহ বিভিন্ন গতিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তা আমরা জানি। কিন্তু তা' ছাড়াও নগণ্য আয়তনের অসংখ্য ঘনীভূত বাষ্পপিণ্ড সৌরজগতের যেখানে সেখানে থেকে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, চক্ষুদ্বারা ত না-ই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দ্বারাও দেখ্‌তে পাই না। ইহারা অনুপরমাণু হ'তে আরম্ভ করে' দশমণ, কুড়িমণ পর্য্যন্ত ওজন-বিশিষ্ট হ'য়ে থাকে।

এসব ছাড়া ধূমকেতুর কক্ষপথে তাদের পরিত্যক্ত পুচ্ছ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ধূমকেতুর ঘনীভূত বাষ্পকণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডাকারে সৌর-জগতে বর্ত্তমান। গ্রহ উপগ্রহগুলি যখন অতিশয় উত্তপ্ত ছিল, তখন তাদের আগ্নেয়গিরি হ'তে অতিবেগে উৎক্ষিপ্ত পিণ্ডসকল গ্রহগুলির আকর্ষণের সীমা ছাড়িয়ে পড়েছিল। সেগুলিও সৌর-জগতেই রয়েছে। এস্‌টারয়েড্‌সের মধ্যেও অসংখ্য ক্ষুদ্র পিণ্ড আছে।

এইসকল পিণ্ড যখন পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হ'য়ে পড়ে, তখন পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণে পিণ্ডগুলি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ধাবিত

হয়। এদিকে পৃথিবীকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার আগে পিণ্ডগুলিকে এই বায়ুর মধ্য দিয়ে আস্‌তে হয়। বাতাসে কোন বস্তু চল্‌তে থাক্‌লে তা' আপন বেগে আপনি উত্তপ্ত হয় ও গতি অধিক হ'লে জ্বলে ওঠে। পিণ্ডগুলিও পড়্‌বার সময়ে বাতাসের সংঘর্ষণে জ্বল্‌তে থাকে। পৃথিবী হ'তে এইগুলিকেই আমরা নক্ষত্র খসে' পড়ার মত দেখি। উল্কাগুলি সাধারণতঃ জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে পথেই ভস্মীভূত হ'য়ে যায়; যেগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, তা'রা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়ে' আপন বেগে মাটীর ভিতর চলে যায়। মাটী খুঁড়ে এইরূপ উল্কা কতকগুলি পাওয়া গেছে।

প্রতিরাত্রেই অল্পবিস্তর উল্কাপাত হ'য়ে থাকে—কিন্তু, বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে অন্যান্য দিন অপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক উল্কাপাত হয়। আষাঢ় মাসের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখে (ইংরাজী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই জুলাই) রাত্রে আকাশের দিকে চাইলে দেখা যায়, উল্কাপাত অন্যদিন অপেক্ষা অনেক বেশী। তেমনি কার্ত্তিকমাসের শেষ তিন দিনেও (ইং ১৪।১৫।১৬ নভেম্বর) উল্কাপাত অধিক। ঐ সকল দিনে পৃথিবী তা'র কক্ষে ভ্রমণ করতে করতে কোন ক্ষুদ্র পিণ্ডসমষ্টির মধ্যে গিয়ে পড়ে।

ব্যায়েলার ধূমকেতুর অদর্শন হওয়ার পর হ'তে প্রতিবৎসর ১৩ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নভেম্বর) পৃথিবীর কোথাও না কোথাও উল্কাবৃষ্টি হ'য়ে থাকে। পূর্ব্ব পাঠে বলা হয়েছে, বর্ত্তমানে ব্যায়েলার ধূমকেতু খণ্ডীভূত হ'য়ে আপন কক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডাকারে রয়েছে। পৃথিবী ১৩ই অগ্রহায়ণ ব্যায়েলার ধূমকেতুর কক্ষ অতিক্রম করে (২৯ নং চিত্র)—সেজন্য ঐ রাত্রে অসংখ্য উল্কাপাত দেখা যায়। এক

একবার ত এত অধিকসংখ্যক উল্কা পড়ে যে, মনে হয় আকাশ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষাধারার ন্যায় পৃথিবীর উপর পড়্‌ছে।
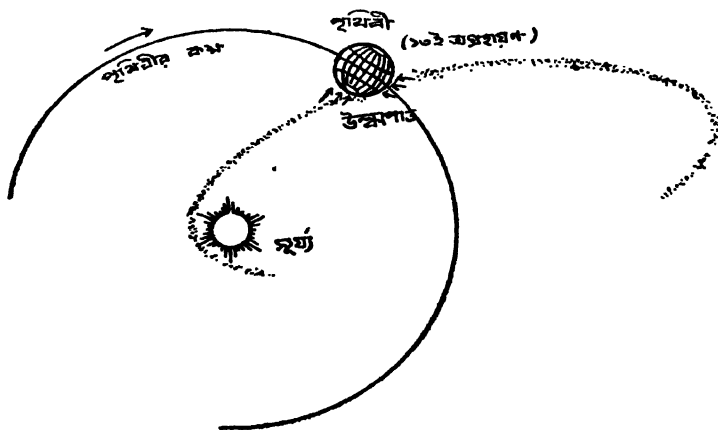
২৯নং চিত্র—১৩ই অগ্রহায়ণের উল্কাপাত

পৃথিবীর ন্যায় সৌরজগতের অন্যান্য সকল গোলকই উল্কাপিণ্ড-গুলিকে স্ব স্ব দেহে আকর্ষণ করে, তার ফলে তা'দের ওজন একটু একটু ক'রে বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য যে, সূর্য্যই অধিকাংশ পিণ্ডকে আপন শরীরে টেনে নেয়।

# সপ্তম অধ্যায়

## রাশিচক্র

একটি গৃহের চারি দেয়ালে চারিখানি চিত্র টাঙ্গান রয়েছে—পূর্ব্ব দেয়ালে বুদ্ধদেবের চিত্র; উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালে যথাক্রমে কাঞ্চনজঙ্ঘা, বিবেকানন্দ ও তাজমহলের। গৃহের মধ্যভাগে টেবিলের উপর একটি প্রদীপ জ্বলে,—তা'র সম্মুখে ব'সে একটি বালক রাত্রি-কালে পড়াশুনা করে। বালকটি টেবিলের সম্মুখে তার ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ করে' বসে। যেদিন সে টেবিলের পশ্চিমদিকে বসে পূর্ব্বমুখী হ'য়ে, সেদিন সে দেখে দীপটা জ্বল্‌ছে বুদ্ধদেবের ছবির সম্মুখে। এইরূপ, দক্ষিণ দেয়ালে বস্‌লে উত্তর দেয়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবির সাম্‌নে এবং টেবিলের পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে বস্‌লে বিবেকানন্দ ও তাজমহলের সম্মুখে দীপটিকে দেখ্‌তে পায়। চিত্রগুলি স্থান পরিবর্ত্তন করে না, প্রদীপও স্থির থাকে, স্থানপরিবর্ত্তন করে শুধু বালকটি—যেজন্য দীপকে বিভিন্ন চিত্রের সম্মুখে দেখ্‌তে পায়।

এখন মনে করা যা'ক্, দেয়ালের চিত্রগুলি আকাশের নক্ষত্র, সম্মুখস্থ দীপটি সূর্য্য ও বালকটি পৃথিবী। চিত্রগুলির ন্যায় নক্ষত্র-রাজি আকাশে স্থির থাকে। প্রদীপের ন্যায় সূর্য্যও স্থির, পৃথিবী শুধু স্থান পরিবর্ত্তন করে' সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে ঘুর্‌তে থাকে।

দিবাভাগে যদি নক্ষত্র দেখা যেত, তাহ'লে পৃথিবী থেকে আমরা দেখ্‌তাম, সূর্য্য দিনের পর দিন স্থির নক্ষত্রগুলির উপর দিয়ে পশ্চিম

হ'তে পূর্ব্বদিকে একটু একটু করে' অগ্রসর হচ্ছে। সূর্য্য ঠিক একস্থানেই রয়েছে—বর্ষকাল ধরে' পৃথিবী ত'ার কক্ষের উপর যত পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বের দিকে যায়, আমরাও সূর্য্যকে নক্ষত্রদের উপর দিয়ে তত পূর্ব্বাভিমুখে যেতে দেখি। এমনি করে পৃথিবী যখন বৎসরান্তে সূর্য্যকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ কর্‌ল, আমরা দেখ্‌লাম কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জের উপর দিয়ে সূর্য্য আকাশে পৃথিবীর চারিদিকে একটি বৃত্তপথে ঘুরে' এল।

নূতন করে' আমাদের বর্ষচক্র আরম্ভ হয়। গত বৎসর ১লা বৈশাখ সূর্য্য যে নক্ষত্রের নিকট হ'তে যাত্রা সুরু করেছিল, এ বৎসরের ১লা বৈশাখেও ঠিক সেই নক্ষত্রের নিকট হ'তেই তা'র যাত্রা সুরু হ'ল। যে সকল নক্ষত্রের উপর দিয়ে গতবৎসর সূর্য্য ভ্রমণ করেছিল, এবারেও ঠিক সেই সব নক্ষত্রের উপর দিয়েই তার গতিপথ। এই প্রতীয়মান রবিপথটির নাম ক্রান্তিবৃত্ত বা অয়নবৃত্ত।

ক্রান্তিবৃত্ত ও রাশিচক্র অনেকসময় একই অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। কিন্তু, ইহারা এক নয়। ক্রান্তিবৃত্তটি আকাশের বেষ্টনী রেখা। রাশিচক্র বেষ্টনী রেখামাত্র নয়, পাশের দিকেও ইহার একটি বিস্তৃতি আছে। রাশিচক্র যেন গগনমণ্ডলের নক্ষত্রখচিত কটিবন্ধ: আকাশে ক্রান্তিবৃত্তের ৯° ডিগ্রী উত্তর হ'তে ৯° ডিগ্রী দক্ষিণ পর্য্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি। ক্রান্তিবৃত্তকে মধ্যস্থলে রেখে ১৮° ডিগ্রীর যে প্রশস্তপথ আকাশকে বেষ্টন করে' আছে তাহাই রাশিচক্র।

পূর্ব্বেই বলেছি, বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ তাদের উপগ্রহদের নিয়ে পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যকে যেমন আমরা ক্রান্তিবৃত্তে ভ্রমণ কর্‌তে দেখি, পৃথিবী থেকে গ্রহ উপগ্রহগণকেও

তেমনি পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। পৃথিবী হ'তে এদের সবার দূরত্ব সমান নয়, প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ গতিপথ; তথাপি ইহারা আমাদের এতদূরে যে, ইহাদের দূরত্বের কোন তারতম্যও আমরা বুঝ্‌তে পারি না। আমরা দেখি, গ্রহ উপগ্রহগুলি সকলেই সূর্য্যের মত রাশিচক্রের নক্ষত্রসমূহের উপর দিয়ে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং এমনি করে তাদের প্রত্যেকেই কেহ বা অল্প কিছুদিনে, কেহ বা সুদীর্ঘকালে এক একটি বৃত্তপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে' আসে। এদের কা'রো ভ্রমণকক্ষ ক্রান্তিবৃত্তের সামান্য উত্তরে, কা'রো বা সামান্য দক্ষিণে। কিন্তু, সকলের পথই রাশিচক্রের অন্তর্গত। পাশের দিকে রাশিচক্রের যে বিস্তৃতি, সেই ১৮° ডিগ্রীর সীমা ছাড়িয়ে উত্তরে বা দক্ষিণে, গ্রহ উপগ্রহগুলি কোন সময়েই যায় না।

রাশিচক্রকে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করা হয়েছে—এক এক অংশ এক এক রাশি। প্রতি রাশিতে সূর্য্য একমাস করে' থাকে। দ্বাদশমাসে সূর্য্যের রাশিচক্রে পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়। এই বিভাগ বহু প্রাচীনকালের। খুব সম্ভব কোন চীনদেশবাসী সর্ব্বপ্রথম রাশিচক্রকে ভাগ করেন, যদিও তিনি ইহাকে ২৮ ভাগে ভাগ করেছিলেন। দ্বাদশ ভাগে ভাগ করা হয় সূর্য্যের অবস্থিতি অনুসারে,—চীনে ২৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল চন্দ্রের প্রাত্যহিক গতি অনুসারে।

প্রতিরাশির উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি নিয়ে প্রাচীন জ্যোতিষী এক একটি আকৃতি কল্পনা করে' সেই আকৃতির নামে প্রতিরাশির নামকরণ করেছেন (৩০ নং চিত্র)। যেমন, মেষরাশির নক্ষত্রগুলিকে রেখাযুক্ত করলে কতকটা মেষের আকৃতি পাওয়া যায়। দ্বাদশ রাশির নাম

এদেশে কারো অজানা নয়—তাদের নাম ক্রমান্বয়ে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। বৈশাখ মাসে সূর্য্য মেষরাশিতে থাকে, জ্যৈষ্ঠ মাসে থাকে বৃষতে, আষাঢ়

৩০নং চিত্র—রাশিচক্র

ও শ্রাবণ মাসে মিথুন ও কর্কটে, কার্ত্তিক মাসে তুলারাশিতে, মাঘমাসে মকরে ও চৈত্রে মীন রাশিতে। একটি বৃত্তকে ৩৬০ ভাগে ভাগ কর্‌লে প্রতি ভাগকে এক এক ডিগ্রী বা অংশ বলা হয়। রাশি-

চক্রকেও ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করা হয়েছে। এক এক রাশিতে ৩০ ডিগ্রী করে' আছে। প্রতিমাসেও সাধারণতঃ ৩০ দিন আছে। সূর্য্য দিনে এক ডিগ্রী পথ অতিক্রম করে। ১লা বৈশাখ সূর্য্য মেষরাশির ১ ডিগ্রীতে থাকে, ২রা ২ ডিগ্রীতে, ৩০ তারিখে সূর্য্য বৃষরাশিতে প্রবেশ বা সংক্রমণ করে, তাই ঐ দিনকে বৃষসংক্রান্তি বলে। পরদিন ১লা জ্যৈষ্ঠ সূর্য্য বৃষরাশির ১ ডিগ্রীতে থাকে। প্রতিমাসেরই শেষদিনটিকে সংক্রান্তি বলে, কারণ ঐ দিনে সূর্য্যকে একটি নূতন রাশিতে সংক্রমণ করতে দেখা যায়।

গ্রহ উপগ্রহগুলিও বিভিন্ন গতিতে রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করে বলে' তাদের ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের নিকটে দেখা যায় এবং তাদেরও আপন আপন গতি অনুসারে রাশি সংক্রমণ হ'য়ে থাকে। এক এক রাশি ভ্রমণ বা ভোগ করতে চন্দ্রের লাগে ২¼ দিন, বুধের লাগে ১৮ দিন, শুক্রের ২৮ দিন, সূর্য্যের ৩০ দিন, মঙ্গলের ৪৫ দিন, বৃহস্পতির ১ বৎসর, শনির ২½ বৎসর, ইউ-রেণাস্-এর ৭ বৎসর, নেপ্‌চুণের ১৪ বৎসর ও প্লুটোর লাগে ২২½ বৎসর। রাশিচক্র-পরিভ্রমণে এইরূপ বিভিন্ন গতিবেগ ছাড়া সূর্য্যের সহিত গ্রহদের অন্যরূপ একটি পার্থক্যও আছে। সূর্য্যের বেলায় রাশিচক্র স্থির, সূর্য্যও স্থির, পৃথিবী শুধু স্বীয় কক্ষে স্থান পরিবর্ত্তন করে। এজন্য সূর্য্যকে আমরা সর্ব্বদা একই গতিতে রাশিচক্রের উপর পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বের দিকে সরে' যেতে দেখি। কিন্তু, গ্রহদের বেলায় রাশিচক্র স্থির, গ্রহগণ গতিশীল, পৃথিবীও গতিশীল। গ্রহ ও পৃথিবী উভয়েই স্থান পরিবর্ত্তন করে বলে' পৃথিবী হ'তে আমরা দেখি, রাশিচক্রে গ্রহগণ সর্ব্বদা সমগতিতে

এবং একই দিকে চলে না। কখনও দেখি কোন গ্রহ বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমে ভ্রমণ করে—তখন বলা হয় গ্রহটি বক্রী হয়েছে। কোন গ্রহকে সাধারণ গতিবেগ অপেক্ষা দ্রুত চল্‌তে দেখ্‌লে আমরা বলি তার অতিচার-গতি হয়েছে; এইরূপ।

ইহা ত গেল পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য রাশিচক্রে সূর্য্য ও গ্রহাদির আপেক্ষিক গতিবিধি। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের জন্য ভূপৃষ্ঠের প্রতিবিন্দু প্রত্যহ একবার চতুর্দ্দিকের সকল নক্ষত্রের সম্মুখীন হয় বলেও আবার আমাদের আকাশের দৃশ্যপট প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হ'তে থাকে। সূর্য্য যেমন এক দিবারাত্রিতে পৃথিবীকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে' আসে, তেমনি যে নক্ষত্র সন্ধ্যায় পূর্ব্বাকাশে থাকে, নিশাশেষে তাকে দেখা যায় পশ্চিম অস্তাচলে, পরদিন সেই নক্ষত্র পুনরায় পূর্ব্বদিগন্তে উদিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য আমরা দেখি, প্রতি জ্যোতিষ্ককে নিয়ে সমস্ত আকাশ যেন একটি মেরু অবলম্বনে ২৪ ঘণ্টায় একবার পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিম দিকে আবর্ত্তন করে। আকাশের এই মেরুরেখা তার উত্তর ও দক্ষিণ বিন্দুর ভিতর দিয়ে, তাই কেবল তাদেরই কোন স্থান-পরিবর্ত্তন হয় না; তা' ছাড়া, আকাশের প্রতিবিন্দুই এক দিবারাত্রিতে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরে আসে। সেই সঙ্গে রাশিচক্রও ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবীর বার্ষিকগতির জন্য সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণ আপন আপন ভ্রমণবেগ অনুসারে রাশিচক্রের উপর ক্রমশঃ পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বদিকে সরে' যেতে থাকে এবং আহ্নিক গতির জন্য রাশিচক্র নিজেই

তা'দের সবাইকে নিয়ে পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিম দিকে প্রত্যহ একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে' আসে।

চব্বিশ ঘণ্টায় রাশিচক্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করে। এজন্য রাশিচক্রের দ্বাদশরাশিই একে একে সূর্য্যের মত প্রত্যহ একবার উদিত হয়, অস্তও যায়। পূর্ব্ব দিগন্তে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর এক একটি নূতন রাশির আবির্ভাব দেখা যায়। সকাল ছয়টায় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে যদি মেষরাশির উদয় হয়, তার দুই ঘণ্টা পরে বৃষরাশির উদয় হ'বে, বেলা ১২টায় হ'বে কর্কটরাশির। তেমনি সন্ধ্যা ছয়টায় মেষরাশি পশ্চিমে অস্ত যাবে, রাত্রি ৮টা ও ১০টায় বৃষ এবং মিথুন রাশিরও অস্ত।

বৎসরের বিভিন্ন দিনে আমাদের আকাশপট নানাভাবেই পরিবর্ত্তিত হ'তে থাকে। বৈশাখমাসের সন্ধ্যায় আকাশে যে সকল নক্ষত্রকে যে স্থানে দেখি, শ্রাবণমাসে তাদের সেস্থানে আর দেখি না—এদিকে কতকগুলি নূতন নক্ষত্রও দেখ্‌তে পাই। কার্ত্তিকমাসের আকাশের দৃশ্য ত বৈশাখ মাস হ'তে প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক্‌। বৈশাখ মাসে সূর্য্য থাকে মেষরাশিতে, সুতরাং মেষরাশির নক্ষত্রসমূহ তখন দিবাভাগেই আকাশে উদিত থাকে। সূর্য্যালোকে সেগুলি আমরা তখন একেবারেই দেখ্‌তে পাই না। কার্ত্তিকমাসে সূর্য্য থাকে তুলারাশিতে। রাত্রিকালে সূর্য্যের বিপরীত দিকে যখন আমরা থাকি, তুলারাশির বিপরীত দিকে অবস্থিত মেষরাশির নক্ষত্রপুঞ্জ তখন আমরা আকাশে দেখি। এইরূপে রাশিচক্রে সূর্য্যের ভ্রমণের জন্য আকাশপটের দৃশ্য-পরিবর্ত্তন হয়। আবার রাশিচক্রে গ্রহ উপগ্রহের ভ্রমণের জন্য এবং রাশিচক্রের নিজেরও আহ্নিক ভ্রমণের জন্য

আকাশপট অবিরাম আমাদের সম্মুখে নূতন নূতন রূপসজ্জা গ্রহণ করতে থাকে।

সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণ কোন্‌দিন রাশিচক্রের কোন্ স্থান অধিকার করে' আছে, কতকগুলি সাঙ্কেতিক লিপি দিয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তা' ব্যক্ত করে' থাকেন। বৃহস্পতি যদি কোনদিন কর্কটরাশির ৫ডিগ্রী ৩০ মিনিটে থাকে, তা'কে লেখা হয় বৃ ৩।৫।৩০; অর্থাৎ সেদিন বৃহস্পতি তিনরাশি অতিক্রম করে' চতুর্থরাশির ৫ ডিগ্রী ৩০ মিনিটে আছে। ইহাকে চতুর্থরাশির ৫ অংশ ৩০ কলাও বলা হয়। এইরূপ, পঞ্জিকাতে কোন বৎসর ৯ই মাঘ ম ০।৬।১৫।৪৫ দেখ্‌লে বুঝতে হ'বে যে, সেই বৎসর ৯ই মাঘ সূর্য্যোদয়কালে মঙ্গলগ্রহ মেষরাশির ৬ ডিগ্রী, ১৫ মিনিট, ৪৫ সেকেণ্ড স্থানে কিংবা ৬ অংশ ১৫ কলা ৪৫ বিকলা স্থানে অবস্থিত।

# অষ্টম অধ্যায়

## সায়ন ও নিরয়ন রাশিচক্র

লাট্টু যদি খুব বেগে ঘোরে, তা'র মেরুদণ্ড ভূমির উপর ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আবর্ত্তনবেগ যখন কমে' যায় মেরুদণ্ডটি তখন আর ভূমির উপর সমকোণ থাকে না, একটু কাৎ হ'য়ে পড়ে। তার ফলে লাট্টুর মাথা শূন্যের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত রচনা করে (৩১নং চিত্র)। ইহাকে লাট্টুর মেরু-দোলন বলা যেতে পারে।
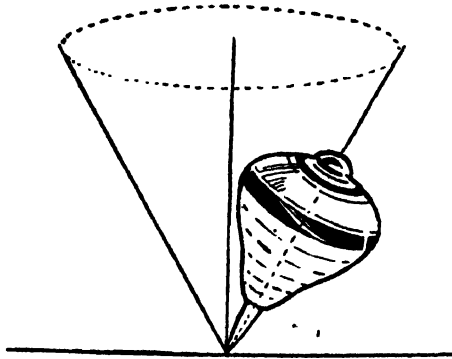
৩১নং চিত্র—লাট্টুর মেরু-দোলন

পৃথিবীর বিষুব প্রদেশের উপর সূর্য্যচন্দ্রের আকর্ষণবলে তার মেরুদণ্ড শূন্যের উপর লাট্টুর মত ঐরূপ বৃত্তরচনা করছে—তবে পৃথিবীর বৃত্তটি লাট্টুর ন্যায় এত ক্ষুদ্র নয় এবং সেই পথে ভূমেরুর

প্রদক্ষিণকালও অতিদীর্ঘ। এই বৃত্তপথে একবার সম্পূর্ণ ভ্রমণ করে' আস্‌তে ভূমেরুর প্রায় ছাব্বিশ হাজার বৎসর লাগে। মেরু অবলম্বনে আবর্ত্তন যেমন পৃথিবীর আহ্নিক-গতি, এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে
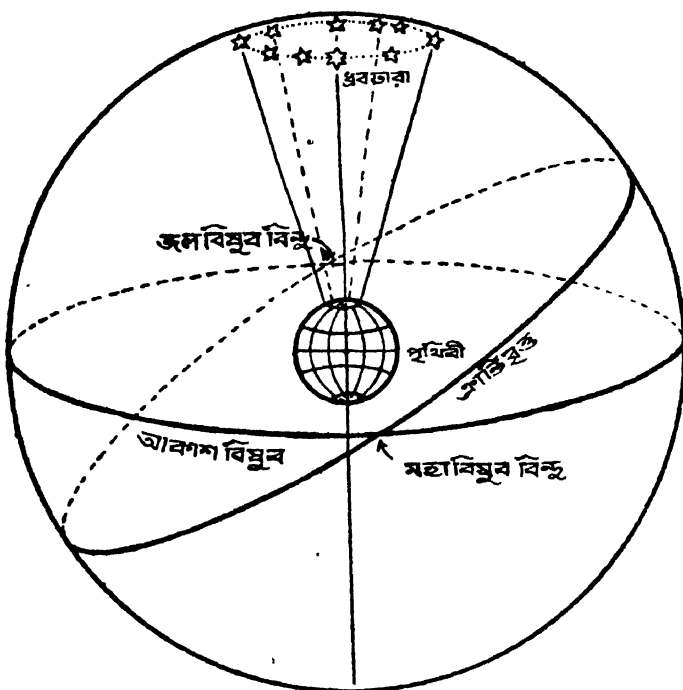
৩২নং চিত্র—পৃথিবীর অয়নগতি

প্রদক্ষিণ যেমন পৃথিবীর বার্ষিক-গতি, শূন্যের উপর ভূমেরুর বৃত্ত-রচনাও সেইরূপ পৃথিবীর অপর একটী গতি। ইহাকে অয়ন-গতি (Precession of the equinoxes) বলে।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড ধীরে ধীরে একটী বৃত্তরচনা কর্‌ছে বলে মহা-শূন্যে ইহার লক্ষ্যস্থলও একটু একটু করে' পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাচ্ছে। বিগত এক সহস্র বৎসর যাবৎ পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরদিকে ধ্রুবতারা অভিমুখে কিংবা তার সন্নিকটে লক্ষ্য রেখে পথ চল্‌ছে, কিন্তু কালক্রমে পৃথিবীর লক্ষ্য আর ধ্রুবনক্ষত্রে থাক্‌বে না, অন্যত্র সরে' যাবে (৩২নং চিত্র)। শিবি (Cepheus), আল্‌ফা ছায়াগ্নি (a Cygni), অভিজিৎ (Vega) প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি একে একে পৃথিবীর উত্তর-দিকে থাক্‌বে। ২৫।২৬ হাজার বৎসর পরে ধ্রুবনক্ষত্রকে আবার এখনকার মত আমাদের উত্তরে দেখা যাবে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল যে বেষ্টনীরেখা আকাশে কল্পিত হয়, তার নাম আকাশ-বিষুব। পৃথিবীর মেরু উক্তপ্রকারে একটী বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে, তাই ইহার নিরক্ষবৃত্ত সর্ব্বদা একই সম-তলে নিবদ্ধ থাক্‌তে পারে না। সুতরাং আকাশ-বিষুবেরও স্থান পরিবর্ত্তন ঘটে।

ক্রান্তিবৃত্ত বা অয়ন-মণ্ডলের সহিত আকাশ-বিষুবের দুইবিন্দুতে ছেদ হয়। এই ছেদবিন্দুদ্বয়ের নাম মহাবিষুব ও জলবিষুব (৩২নং চিত্র)। ভ্রমণকালে সূর্য্য যেদিন মহাবিষুব কিংবা জলবিষুব বিন্দুতে এসে উপস্থিত হয়, সেদিন ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র দিবাভাগ ও রাত্রিমান সমান।

অয়নমণ্ডল ও আকাশ-বিষুব উভয়ে স্থির থাক্‌লে তাদের ছেদ-বিন্দুরও স্থান-পরিবর্ত্তন হ'ত না। কিন্তু পৃথিবীর মেরুদোলন হেতু আকাশবিষুব সামান্য সঞ্চরণশীল। এ কারণে উভয়ের ছেদবিন্দুদ্বয়ও অয়নমণ্ডলের উপর একটু একটু করে' সরে' যায়। মহাবিষুব-

বিন্দু যে সময়ে এবং যে দিকে যতটুকু যায়, তদ্বিপরীতস্থ জলবিষুববিন্দুও সেইদিকে ততটুকুই সরে' আসে। অয়নমণ্ডলে ইহারা পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমদিকে ভ্রমণ করে। ইহাদের গতি বৎসরে মাত্র ৫০"·২৪ বিকলা বা সেকেণ্ড। অর্থাৎ ইহারা গড়ে ৭২ বৎসরে * অয়নমণ্ডলের এক ডিগ্রী পরিমিত স্থান ভ্রমণ করে। যেমন, যদি ১৮২১ শকাব্দে ( ১৮৯৯ খৃঃ ) ৮ই চৈত্র ও ৮ই আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হ'য়ে থাকে, এখনও তেমনই চল্‌ছে; আবার ১৮৯২ শকাব্দ হ'তে তার পরের ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত ৭ই চৈত্র ও ৭ই আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হ'তে থাকবে। পৃথিবীর মেরু-দোলন হেতু অয়নমণ্ডলে বিষুব-বিন্দুদ্বয় ঐরূপ ধীরে ধীরে ভ্রমণ করে। এজন্য ইহাকে অয়নগতি বা অয়ন-চলন নাম দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় হিন্দু-জ্যোতিষে অশ্বিনী নক্ষত্রের আদি বিন্দু হ'তে রাশিচক্র গণনা করা হয়। আকাশের নক্ষত্রগণের পরস্পরের মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতি পৃথিবী হ'তে দেখা যায় না। নক্ষত্র-সান্নিধ্য হ'তে গণনা করা হয় বলে হিন্দু-জ্যোতিষে রাশিচক্র স্থির —ইহার কখনও স্থান-পরিবর্ত্তন হয় না।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষে রাশিচক্র গণিত হয় মহাবিষুব-বিন্দু হ'তে। মহাবিষুববিন্দু ৭২ বৎসরে একডিগ্রী পশ্চিমে সরে' যায়—এজন্য পাশ্চাত্য রাশিচক্রও প্রতি ৭২ বৎসর অন্তর এক এক ডিগ্রী পশ্চিমে অপসারিত হয়।

সম্প্রতি ৮।৯ই চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি; অর্থাৎ আমাদের মীন

* সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ৬৬ বৎসর ৮ মাসে।

রাশির অষ্টম ডিগ্রীতে যেদিন সূর্য্য অবস্থান করে সেদিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবা ও রাত্রি সমান হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে এখন ঐ মীনের অষ্টম ডিগ্রী হ'তে রাশিচক্র গণনা আরম্ভ করা হয়েছে। সুতরাং হিন্দু রাশিচক্রের মীনের ৮° হ'তে মেষের ৭° পর্য্যন্ত স্থান
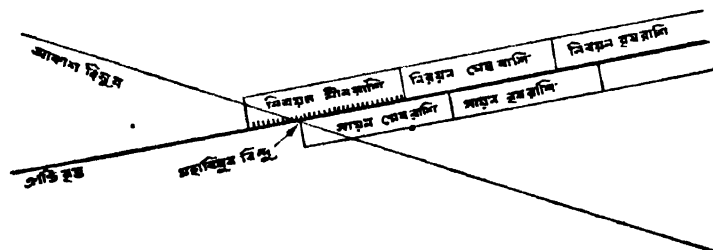
৩৩নং চিত্র—বর্ত্তমান সায়ন ও নিরয়ন রাশি

পাশ্চাত্য মতে মেষরাশি; তারপর ক্রমান্বয়ে বৃষ, মিথুন ইত্যাদি। এই হিসাবে পাশ্চাত্য রাশিচক্র ভারতীয় রাশিচক্র অপেক্ষা ২২° অগ্রসর রয়েছে (৩৩নং চিত্র)।

হিন্দু-জ্যোতিষে রাশিচক্রের সহিত পৃথিবীর অয়নগতি হিসাব করা হয় না বলে' এই নিরপেক্ষ গণনাকে নিরয়ন-রাশিচক্র বলে। অয়নগতি-যুক্ত পাশ্চাত্য রাশিচক্রকে সায়ন-রাশিচক্র বলা হয়।

আমাদের পঞ্জিকায় নিরয়ন রাশিচক্র অনুসারে গ্রহাদির অবস্থিতি লিপিবদ্ধ থাকে। ইহাদের স্থিতাংশে ২২° যোগ কর্‌লে সায়ন রাশিচক্রে তা'দের স্থিতি অবগত হ'তে পারা যায়। যেমন বুধগ্রহ নিরয়ন-মেষের ১৬° ডিগ্রীতে থাক্‌লে তাকে সায়ন-বৃষের ৮° ডিগ্রীও বলা যেতে পারে। এগুলি শুধু স্থিতিস্থানের নামের পার্থক্য, এতে সত্যিকারের স্থিতিস্থানের কোন প্রভেদ হয় না।

নিরয়ন-মেষের প্রথম বিন্দু হ'তে মহাবিষুববিন্দু যত দূরে তার নাম অয়নাংশ; অর্থাৎ সায়ন ও নিরয়ন রাশিচক্রের পার্থক্য ঐ ২২° ডিগ্রীকে অয়নাংশ বলে। বিষুব-বিন্দুর পশ্চিমগতির নিমিত্ত অয়নাংশ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে; ক্রমে ইহা ২৩°, ২৪°, ইত্যাদি হ'বে। এক কালে যখন ১লা বৈশাখ দিবারাত্রি সমান হ'ত, মহাবিষুববিন্দু তখন অশ্বিনী-নক্ষত্রের প্রারম্ভে ছিল এবং তখন নিরয়ন ও সায়ন রাশিচক্রে কোন ভেদ ছিল না, অয়নাংশ ছিল শূন্য*। তারও পূর্ব্বে নিরয়ন-রাশিচক্রই সায়ন-চক্র অপেক্ষা অগ্রসর ছিল, অর্থাৎ তখন রাত্রি ও দিন সমান হ'ত ১লা বৈশাখের পূর্ব্বের তারিখে নয়, পরের তারিখ সমূহে।

বৈদিক যুগের শেষাংশে মহাবিষুববিন্দু রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। রোহিণী নক্ষত্রের এলাকা নিরয়ন বৃষরাশির ১০° হ'তে ২৩⅓° ডিগ্রী পর্য্যন্ত। সেই যুগে এরই কোন একটা অংশে মহাবিষুববিন্দু ছিল। সেই অংশ থেকে মহাবিষুব বর্ত্তমানে মীনরাশির ৮° ডিগ্রীতে এসেছে। বৈদিক কাল হ'তে এ পর্য্যন্ত মহাবিষুববিন্দু মাত্র কিঞ্চিদধিক ৬০° ডিগ্রী ভ্রমণ করতে পেরেছে।

রাশিচক্রে গ্রহগণ পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বের দিকে অগ্রসর হয়, বিষুববিন্দু ভ্রমণ করে পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিম দিকে। এজন্য রাশি-চক্রের উপর বিষুববিন্দুদ্বয়ের গতি সর্ব্বদাই বক্রী।

* ৩৬০০ কল্যাব্দে (৪২১ শকাব্দে) অয়নাংশ শূন্য ছিল। সম্প্রতি ৫০৩৭ কল্যাব্দ চলছে।

# নবম অধ্যায়

## কালনিরূপণ

### ঘড়ি

প্রতিদিনের সকল কাজে নিয়মশৃঙ্খলা রাখ্‌তে হিসাব একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবী প্রত্যহ একই সময়ে আবর্ত্তন করে—তাই দিবা ও রাত্রির মোটামুটি বিভাগ আমরা সূর্য্য হ'তে সহজেই পেয়ে থাকি। সূর্য্যোদয় হ'তে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দিন, সূর্য্যাস্ত হ'তে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রাত্রি। আগেকার যুগের মানুষের এতেই চলেছিল,—দিবসে আহারাদির চেষ্টা ও রাত্রির অন্ধকারে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন বিশেষ কোন কাজ যখন তা'র ছিল না।

ক্রমে মানুষের কাজের সংখ্যা যত বেড়ে চল্‌ল, সকল কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় রাখা তত কঠিন হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কোন কাজে হয়ত কিছু বেশী সময় গেল, অপর একটি প্রয়োজনীয় কাজ কর্‌বার পূর্ব্বেই চারিদিক অন্ধকার করে' রাত্রি এল—তা' আর করা হ'লই না। এইরূপে বহু অসুবিধা ভোগ করে' মানুষ নানা উপায়ে সময়ের হিসাব রাখ্‌বার চেষ্টা আরম্ভ কর্‌ল।

সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ প্রথম কালনিরূপণ যন্ত্রের কাজ করেছে। পূর্ব্বাহ্নে সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে থাকে, মধ্যাহ্নে মাথার উপরে ও অপরাহ্নে পশ্চিমে থাকে। সূর্য্যের অবস্থিতি দেখে দিবসের কতক্ষণ বাকী,

তা' কতকটা বুঝ্‌তে পারা যায়। রাত্রিকালে কতকগুলি নক্ষত্র-পুঞ্জের অবস্থিতি দেখে কেউ কেউ সময় নিরূপণ কর্‌তেন। সে কালের মানুষ ছায়া দেখেও সময় নিরূপণ করেছেন; প্রাতঃকালে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে থাকে, সম্মুখের প্রাঙ্গণস্থ বৃক্ষচ্ছায়া দীর্ঘভাবে তখন পশ্চিমে পড়ে। ক্রমশঃ যত বেলা হয়, ছায়া ততই খর্ব্ব হ'তে থাকে, দ্বিপ্রহরের ছায়া সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। তারপর সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়্‌লে ছায়া দিক্‌পরিবর্ত্তন করে' পূর্ব্বদিকে যায় ও ক্রমশঃ ইহার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রত্যহ এইরূপ ছায়া দেখে অভ্যস্ত চক্ষু সহজেই বুঝ্‌তে পারে, দিবসের কোন্ সময়ে কিরূপ ছায়াপাত হ'তে পারে। এদেশের গ্রামে এখন পর্য্যন্তও ছায়াদ্বারা সময়নিরূপণ কর্‌তে দেখা যায়। সূর্য্যোদয়, দ্বিপ্রহর ও সূর্য্যাস্ত-কালের ছায়ার মধ্যস্থ কোণগুলি সমভাগে বিভক্ত করে' ক্রমশঃ সূর্য্যঘড়ির উৎপত্তি হয়। ইহা দ্বারা প্রাচীন আর্য্যগণ খুব সূক্ষ্মভাবে সময়ের হিসাব রাখ্‌তে পার্‌তেন। কিন্তু এই উপায়ে মেঘ্‌লা দিনে ও রাত্রিকালে সময় স্থির করা যেত না।

সূর্য্যঘড়ি ভিন্ন আরও 'দু' একটি উপায়ে সময় নিরূপিত হ'ত। আমাদের দেশে ক্ষুদ্রছিদ্রবিশিষ্ট জলপূর্ণ কোন পাত্রে কতকগুলি চিহ্ন করা থাক্‌ত। ছিদ্রপথ দ্বারা জল কমে' কমে' পাত্রের জল প্রথম হ'তে দ্বিতীয় চিহ্নে যেতে যে সময় লাগে, দ্বিতীয় হ'তে তৃতীয় চিহ্নে যেতেও ঠিক সেই সময় লাগে। কেউ বা জলের পরিবর্ত্তে বালি ব্যবহার কর্‌তেন। ছিদ্রযুক্ত পাত্র জলে ডুবিয়ে রেখে কি পরিমাণ জল কত সময়ে পাত্রে প্রবেশ করে' তাই থেকেও সময়ের হিসাব রাখা হ'ত। পাশ্চাত্য দেশে মোমবাতির

গাত্রে চিহ্ন করে প্রজ্বলিত মোমের পরিমাণানুসারে সময় স্থির করা হ'ত।

ক্রমশঃ ঘড়ির প্রচলন হ'ল। ইহা সূর্য্যঘড়িরই উন্নত সংস্করণ। একটি বৃত্তাকার ফলকে ১ থেকে ১২ পর্য্যন্ত সংখ্যা সমান দূরে দূরে লেখা থাকে। তার উপরে দুইটি কাঁটা স্প্রীংএর সাহায্যে ঘুরে' সময় নির্দ্দেশ করে। কাঁটার গতি নিয়মিত করার জন্য ঘড়িতে বিবিধ কলকৌশল আছে। এক সূর্য্যোদয় হ'তে পরের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে ২৪ ভাগে বিভক্ত করে তা'র প্রথম অর্দ্ধাংশ দিবস ও অপরার্দ্ধ রাত্রি মনে করে নেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য মতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হ'তে দিবস গণনা করা হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহর হ'তে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টা। ঘড়িতে যখন ১২টা, তখন হয় দিবা দ্বিপ্রহর, না হয় রাত্রি দ্বিপ্রহর।

ঘণ্টাকে ৬০ মিনিটে ও মিনিটকে ৬০ সেকেণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে দিবসকে আরো অনেক সূক্ষ্মভাগে ভাগ করা হ'য়ে থাকে। পৃথিবীর আবর্ত্তনকালকে এদেশ ৬০ দণ্ডে, দণ্ডকে ৬০ পলে, পলকে ৬০ বিপলে ও বিপলকে ৬০ অনুপলে পর্য্যন্ত বিভক্ত করেছে। একটি দিন ভারতবর্ষে ১২৯৬০০০০ (৬০ × ৬০ × ৬০ × ৬০) অনুপলে বিভক্ত, যেখানে পাশ্চাত্য দেশ দিনকে মাত্র ৮৬৪০০ (২৪ × ৬০ × ৬০) সেকেণ্ডে ভাগ করেছে। এক সেকেণ্ডে ১৫০ অনুপল।

## দৈনিক সময়

দুই প্রকারে দিনের হিসাব করা হয়, সৌরদিন ও নাক্ষত্রিক দিন। সূর্য্যের অবস্থিতি অনুসারে যে দিনের ব্যাপ্তি স্থির করা

হয় তাহা সৌরদিন। সৌরদিন ২৪ ঘণ্টাব্যাপী। বৎসরের কোন কোন সময়ে পৃথিবীর আবর্ত্তনকাল ২৪ ঘণ্টার ঈষৎ বেশী এবং কোন কোন সময়ে ঈষৎ কম হ'লেও সারাবৎসরের আবর্ত্তনকাল গড়ে ২৪ ঘণ্টা। সৌরদিনকে মধ্যম সাবন দিনও (Mean solar day) বলা হয়।

ভারতবর্ষের দিন এক সূর্য্যোদয় হ'তে পরের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত। সর্ব্বদেশের মানমন্দিরেই সূর্য্যের উদয়ানুসারে দৈনিক সময়ের হিসাব রাখা হয়। পাশ্চাত্য দেশের তারিখ আরম্ভ হয় রাত্রি দ্বিপ্রহরে। এই হিসাবে পশ্চিমের দিন ভারতবর্ষের দিন হ'তে প্রায় ছয় ঘণ্টা অগ্রসর থাকে। রবিবার এদেশে আরম্ভ হয় প্রাতঃকালে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে, পাশ্চাত্য নিয়মে রবিবার আরম্ভ হয় তার ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে মধ্যরাত্রে। গণনা যখন থেকেই হোক্, সর্ব্বদেশেরই প্রচলিত দিনের ব্যাপ্তি ২৪ ঘণ্টা।

নাক্ষত্রিক দিন কেবলমাত্র জ্যোতির্ব্বিদের নিকট প্রয়োজনীয়। ইহার দৈর্ঘ্য ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট। মেরু অবলম্বনে পৃথিবীর আবর্ত্তনের জন্য সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হয়, এবং কক্ষবৃত্তে পৃথিবীর ভ্রমণের জন্য সূর্য্যকে রাশিচক্রে ভ্রমণ কর্‌তে দেখা যায়। আকাশের যেস্থানে এখন সূর্য্যকে দেখা যায়, কাল আবার সূর্য্য ঠিক সেই-স্থানে এলেই একটি সৌরদিন সম্পূর্ণ হ'ল। আকাশের যে অংশে এখন রাশিচক্রের যে অংশ আছে, সে অংশ কাল ঠিক ঐ স্থানে যখন আস্‌বে, তখন একটি নাক্ষত্রিক দিন সম্পূর্ণ হ'বে। নক্ষত্র অনুসারেই রাশিচক্রের পরিচয়, সেজন্য এই দিনের নাম নাক্ষত্রিক দিন (Sidereal day)।

১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যের সহিত মেষরাশির প্রথম ডিগ্রী পূর্ব্ব-দিগন্তে থাকে, ২রা সূর্য্য দ্বিতীয় ডিগ্রীতে অবস্থান করায় মেষের প্রথম ডিগ্রী সূর্য্যের কিছু পূর্ব্বেই দিগন্তে উদিত হয়। উভয়দিনের সূর্য্যোদয়ের ব্যবধান ২৪ ঘণ্টা, কাজেই উভয়দিনের মেষের প্রথম ডিগ্রীর উদয়ের ব্যবধান ২৪ ঘণ্টার কিছু কম। উভয়দিনের সূর্য্যোদয়ের ব্যবধান যেমন একটি সৌরদিন, উভয়দিনের মেষের প্রথম ডিগ্রীর উদয়ের ব্যবধান তেমনই একটি নাক্ষত্রিক দিন। নাক্ষত্রিক দিনের ব্যাপ্তি ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট।

দৈনিক সময়ের পরিমাণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমান হ'লেও ঘড়ির সময় বিভিন্ন হ'য়ে থাকে। পূর্ব্বদিকের দেশগুলিতে সূর্য্যোদয় হয় আগে, পশ্চিমের দেশে হয় তার পরে। সেজন্য পূর্ব্বদেশবাসীর ঘড়ির সময় পশ্চিমদেশবাসীর সময় অপেক্ষা অগ্রসর থাকে। জাপানকে পৃথিবীর পূর্ব্বসীমান্ত বলা হয়—জাপানের ঘড়ি সেজন্য সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর।

পৃথিবীর বিষুববৃত্তের ৩৬০ ডিগ্রী সূর্য্যেব সম্মুখে একবার আবর্ত্তন করে ২৪ ঘণ্টায়। এই হিসাব মত এক ডিগ্রী পরিমিত স্থান সূর্য্যের সম্মুখে আসতে ৪ মিনিটকাল অতিবাহিত হয়। পৃথিবীর যেস্থান এক ডিগ্রী পূর্ব্বে অবস্থিত, তার সময় ৪ মিনিট অগ্রসর। কলিকাতা দিল্লী হ'তে ১১ ডিগ্রী পূর্ব্বে অবস্থিত, সেজন্য কলিকাতার ঘড়ি দিল্লীর সময় অপেক্ষা ৪৪ মিনিট অগ্রসর—দিল্লীতে যখন ১২টা, কলিকাতায় তখন ১২টা বেজে ৪৪ মিনিট।

উপরোক্ত দুইপ্রকার দিন ব্যতীত আর একপ্রকার দিনের হিসাবও হিন্দুর পূজাপার্ব্বণে ও মুসলমানের ইদ্‌মহরমে প্রয়োজন

হয়। তাকে চান্দ্রদিন বা তিথি বলে। এক অমাবস্যা হ'তে আর এক অমাবস্যার মধ্যে ত্রিশটি তিথি আছে। চন্দ্র এই ত্রিশ তিথিতে রাশিচক্রের ৩৬০ ডিগ্রী পথ একবার পরিভ্রমণ করে। কাজেই ১২ ডিগ্রী পথে চন্দ্রের ভ্রমণকাল এক একটি তিথির পরিমাণ। চন্দ্রের প্রদক্ষিণকাল ২৯½ দিন। এই ২৯½ দিনে ৩০টি তিথি হয় বলে' এক একটি তিথিতে গড়ে ২৪ ঘণ্টার চেয়ে কিছু কম সময় থাকে। সকল তিথির ভোগকাল সমান নয়, কারণ রাশিচক্রে চন্দ্রের গতি কোন সময়ে দ্রুত, কোন সময়ে ধীর। একটি তিথির ভোগকাল ২৬ ঘণ্টার বেশী হয় না এবং ২১½ ঘণ্টার কম হয় না।

আমাদের দিনগুলি সর্ব্বদাই চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী, সেজন্য একই দিনে একটি সম্পূর্ণ তিথি কিংবা একটি তিথি ও অপর একটি তিথির অংশ, অথবা একটি তিথি ও দুইটি তিথির অংশ পড়্‌তে পারে। তিথি আরম্ভ বা শেষ হবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই—দিবায় বা রাত্রিতে যে কোন সময়ে নূতন তিথি আরম্ভ হ'তে পারে। সূর্য্যোদয়ের সময়ে যে তিথি থাকে, সেই তিথিও সেই দিনটির পরিচয়।

## সপ্তাহ

প্রাচীনকালে সূর্য্য, চন্দ্র ও পাঁচটি গ্রহের কথা মানুষ জান্‌ত। তাদের নাম অনুসারে প্রতি ৭টি দিন বা বারকে ৭টি নাম দেওয়া হয়। রবিবারের পরদিন সোমবার, তারপর মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। শনিবারের পরদিন আবার রবিবার। কার্য্য-কলাপের সুবিধার জন্যই বৎসরকে এইরূপে ভাগ করা হয়—চান্দ্র-

মাস, সৌরবৎসর প্রভৃতির ন্যায় ইহা কোন স্বাভাবিক নিয়মে বিভক্ত হয়নি। অবশ্য হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদের কাছে এই সকল দিনের বিভাগ একেবারে নিরর্থক নয়। পাশ্চাত্য দেশের বারের নামগুলিও একই অর্থ প্রকাশ করে—সান্‌ডে (Sun's-day) অর্থ রবিবার, মণ্ডে (Moon's-day) নাম চন্দ্র হ'তে, স্যাটার্‌ডে (Saturn's-day), টিউ বোদেন্‌, থর ও ফ্রিগা (Tiu, Woden, Thor, Friga) নরওয়ে দেশে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রের নাম।

এই সাতটি দিনকে সপ্তাহ (Week) বলে। বৎসরে ৫২টি সপ্তাহ আছে।

## সৌরমাস, চান্দ্রমাস ও মলমাস

এক এক রাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকাল এক একটি সৌরমাসের পরিমাণ। যেদিন সূর্য্য কোন নূতন রাশিতে প্রবেশ করে, তার পরদিন হ'তে পরের রাশিতে প্রবেশের দিন পর্য্যন্ত এক মাসের দিন সংখ্যা গণনা করা হয়। মেষরাশিতে যে মাসে সূর্য্য থাকে তার নাম বৈশাখ মাস, বৃষতে থাক্‌লে জ্যৈষ্ঠমাস, এইরূপ কুম্ভ ও মীনে যখন থাকে তখন ফাল্গুন ও চৈত্র মাস। মেষরাশিতে সূর্য্য যে মাসে থাকে, সে মাসের পূর্ণিমায় চন্দ্রকে বিশাখা নক্ষত্রের সন্নিকটে দেখা যায়—সেজন্য ঐ মাসকে বৈশাখ মাস বলা হয়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রানুসারে জ্যৈষ্ঠমাস; এইরূপ নক্ষত্রের নামানুসারে প্রতি মাসের নাম দেওয়া হয়েছে। ৩৬৫ দিন বা বার মাসে এক বৎসর, তাই প্রতিমাস গড়ে ৩০ দিন ব্যাপী। বার মাসের নাম—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ,

ফাল্গুন ও চৈত্র। পাশ্চাত্যে প্রচলিত দ্বাদশ মাসের নাম—জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর। ভারতবর্ষে প্রতি রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি অনুসারে মাসের দিনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়। মেষরাশিতে সূর্য্য যদি ৩১ দিন থাকে, বৈশাখ মাসে ৩১ দিন হবে। প্রতি বৎসরই যে ৩১ দিন হ'বে তাও নয়, ৩০ দিনও হ'তে পারে, আবার ৩২ দিনও হ'তে পারে। কিন্তু ইংরাজী মাসগুলির দিন-সংখ্যা প্রতিবৎসর সমানই থাকে। জানুয়ারী, মার্চ্চ, মে, জুলাই, আগষ্ট, অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে ৩১ দিন ও অন্যান্য মাসগুলিতে ৩০ দিন, কেবল ফেব্রুয়ারী মাসে ২৮ দিন।

চন্দ্র যে সময়ে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করে, তার পরিমাণ আমাদের ২৯½ দিনের সমান। এই সময়কে চান্দ্রমাস বলে। চান্দ্রমাসে ৩০টি তিথি বা চান্দ্রদিন আছে। উত্তর ভারতবর্ষে পূর্ণিমার পর হ'তে পরের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস গণনা করা হয়; দাক্ষিণাত্যে গণনা হয় অমাবস্যা হ'তে।

দ্বাদশ চান্দ্রমাসে একটি চান্দ্রবৎসর হয়। চান্দ্রবৎসরের পরিমাণ ৩৫৪ ( ২৯½ × ১২ ) দিন। সৌরবৎসর ৩৬৫ দিন ব্যাপী,—চান্দ্র-বৎসর অপেক্ষা ১১ দিন অধিক। ১লা বৈশাখ যদি চান্দ্রবর্ষ আরম্ভ হয়, চৈত্রসংক্রান্তির ১১ দিন পূর্ব্বেই চান্দ্রবর্ষ সমাপ্ত হয়ে যাবে। এইরূপে চান্দ্রবর্ষ ৩ বৎসরে প্রায় ৩৩ দিন বা একমাস অগ্রসর হয়ে পড়্‌বে। চতুর্থ বৎসরে যখন সৌর বৈশাখমাস আরম্ভ হ'বে, তখন চান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাস। এইরূপে আরও কয়েকবৎসর পরে সৌর বৈশাখ মাসেই চান্দ্র আশ্বিন মাস পড়তে পারে। তার

অনেক অসুবিধা আছে। চান্দ্রমাস অনুসারে আমাদের পূজাপার্ব্বণ, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি হ'য়ে থাকে—এদিকে ঋতু সৌরমাসকে অনুসরণ করে। আশ্বিনের শারদীয়া পূজা গ্রীষ্মে হওয়া অশোভন, এবং শরৎকালের শস্যাদি গ্রীষ্মকালে রোপণ করলে জন্মিবেও না। এইসব অসুবিধার জন্য প্রতি তৃতীয় বর্ষে একটি চান্দ্রমাসকে মলমাস বলে ত্যাগ করা হয়। মলমাসে কোন শুভ কর্ম্ম করা নিষিদ্ধ। তৃতীয় বৎসরে সৌরবর্ষের ১২টি মাসে ১৩টি অমাবস্যা হয়, কাজেই কোন একটি সৌর মাসে দুইদিন অমাবস্যা তিথি পড়ে। এই দুই অমাবস্যার মধ্যবর্ত্তী মাসটিকে মলমাস ব'লে গণ্য করা হয়।

মুসলমানগণও চান্দ্রবর্ষ অনুসারে তাঁদের পর্ব্বানুষ্ঠান করে' থাকেন, কিন্তু তাঁদের মলমাস না থাকায় ইদ্ মহরমাদি পর্ব্ব সৌরবর্ষের যে কোন মাসেই হ'তে পারে।

## বৎসর

তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন, ছয় ঘণ্টা বা ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে পৃথিবী সূর্য্যকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে। ইহাই সৌরবর্ষের দিনসংখ্যা।

পূর্ব্বে যখন জ্যোতিষের এত উন্নতি হয়নি তখন লোকে ৩৬৫ দিন অনুসারেই বর্ষগণনা করত। ইহাতে অনেক অসুবিধা হচ্ছিল। ক্ষুদ্র $\frac{১}{৪}$ দিনটি চারি বৎসরে হয় ১দিন, ২০ বৎসরে হয় ৫ দিন, ১০০ বৎসরে হয় ২৫ দিন। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বৎসরের প্রথম দিনে সূর্য্য রাশিচক্রের যে স্থানে ছিল, ১০০ বৎসর পরে বৎসরের প্রথম দিনে দেখা গেল সূর্য্য তার থেকে ২৫ ডিগ্রী দূরে

আছে—জ্যোতিষের গণনায়ও ভুল হ'তে লাগল। হিসাবের ভুল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল দেখে রোমের জুলিয়াস্‌ সীজার খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৪ সনে মিশরের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদের সাহায্যে বর্ষ-গণনার ভুল শুদ্ধ করেন। ¼ দিনটি চারিবৎসরে ১ দিন হয়। মিশরীয় জ্যোতির্ব্বিদের কথানুসারে তখন হ'তে প্রতি চতুর্থ বৎসরের দিনসংখ্যা ৩৬৬ দিন বলে' ধার্য্য করা হয়। এইরূপ একটি বৎসরকে লীপ্‌ ইয়ার (Leap year) বলে। যে খৃষ্টাব্দ সংখ্যা ৪ দ্বারা বিভাজ্য, সে খৃষ্টাব্দই লীপ্‌ ইয়ার। অধিক দিনটি ফেব্রুয়ারী মাসে যোগ করা হয় বলে' লীপ্‌ইয়ারে ফেব্রুয়ারী মাসে ২৯ দিন। জুলিয়াস্‌ সীজার কর্ত্তৃক ইহা শুদ্ধ হয়েছিল; তাই এই বর্ষপঞ্জীকে জুলিয়ান বর্ষপঞ্জী ( Julian calendar ) বলা হয়। তারপরে আর অত গণ্ডগোল হয়নি।

কিন্তু বহুকাল পরে দেখা গেল, হিসাবে একটু ভুল র'য়ে গেছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে গ্রেগরী আবার বর্ষপঞ্জী শুদ্ধ করে' দেন। তিনি দেখ্‌লেন যে, ৪০০ বৎসরে ১০০টি লীপ্‌ ইয়র না হ'য়ে ৯৭টি হ'লে গণনার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রের অবস্থান মিলে যায়। তাঁর সময় হ'তে, যে শতাব্দীকে ৪০০ দ্বারা ভাগ করা যায় সেই শতাব্দীকেই কেবল লীপ্‌ ইয়ার বলে গণ্য করা হয়—প্রতি চতুর্থ শতাব্দী এক একটি লীপ্‌ ইয়ার। ১৭০০, ১৮০০ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দ লীপ্‌ ইয়ার ছিল না—কিন্তু ২০০০ খৃষ্টাব্দটি লীপ্‌ ইয়ার হ'বে।

ভারতবর্ষে রাশিচক্রে সূর্য্যের অবস্থান অনুসারে মাস এবং বৎসরের হিসাব থাকায়, তার গণনা বহু প্রাচীন কাল হ'তেই শুদ্ধ রয়েছে।

বৎসরকে দুইভাগে ভাগ করে' উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন নাম দেওয়া হয়েছে। ৮ই পৌষ সূর্য্যকে আকাশের সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণে দেখা যায়। ইহার পরদিন হ'তে সূর্য্য উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হ'তে থাকে ৮ই আষাঢ় পর্য্যন্ত। এই ছয়মাসকাল উত্তরায়ণ। ৮ই আষাঢ়ের পরদিন সূর্য্য দক্ষিণাভিমুখী হয়, বা সূর্য্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়।

সূর্য্যোচ্চ হয় ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে। তার পরদিন ১লা জানুয়ারী হ'তে ইংরাজী বর্ষ আরম্ভ হয়।

# দশম অধ্যায়

## গ্রহনক্ষত্রের জন্মকথা

অনন্ত আকাশে বহু যোজনব্যাপী বিস্তৃত বাষ্পরাশিকে পৃথিবী হ'তে মেঘ বা স্তূপীভূত ধূমের মত দেখায়। ইহাকে নীহারিকা বলে। ইহাদের মধ্যে অনেক সময়ে নক্ষত্রাদি বিবিধ জ্যোতিষ্ক বর্ত্তমান থাকে। খালি চোখে দু' একটি মাত্র নীহারিকা আমাদের দৃষ্টিপথে আসে; শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে মহাকাশে অসংখ্য নীহারিকা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নক্ষত্রমাত্রেরই উৎপত্তি কোন না কোন নীহারিকা হ'তে—কিন্তু সকল নীহারিকা নক্ষত্রের জন্ম দিতে পারে না। নীহারিকার এইরূপ বিবিধ প্রকারভেদ আছে। ছায়া-পথের সন্নিকটে এক একটি নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে যে সুবিস্তৃত নীহারিকা দেখা যায়, আবহমানকালেও তা' হ'তে নক্ষত্র-সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। নীহারিকাগুলি সাধারণতঃ অতি বিশালায়তন। নক্ষত্রের জন্মদাতা অতিক্ষুদ্র একটি নীহারিকার আয়তন অঙ্কদ্বারা খুব সংক্ষেপে লেখা গেলেও ইহা এত বৃহৎ যে, মানব কল্পনা তার কাছে হার মানে। সূর্য্য অপেক্ষা বহুগুণ বড় এমন কোটি কোটি নক্ষত্রও একটি নীহারিকা হ'তে জন্মগ্রহণ কর্‌তে পারে।

ঘরের মধ্যে এক মুষ্টি বাষ্প ছেড়ে দিলে তা' একত্র জমাট বাঁধে না—তার অণুগুলি সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। বাষ্পীয় অণুর পরস্পর হ'তে ছুটে চলে যাবার এইরূপ একটি ভ্রমণবেগ আছে। কোথাও বাষ্পকণার যথোপযুক্ত প্রাচুর্য্য ঘট্‌লে এমন অবস্থা

আসা সম্ভব যে, তাদের সকলের সম্মিলিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রত্যেক অণুর দূরে চলে যাবার ঐ বেগ নিরোধ করে' তাদের একত্র সমষ্টিবদ্ধ করতে পারে। নীহারিকার অণুসমূহও সংখ্যাধিক্য হেতু আকাশময় ছড়িয়ে পড়্তে পারে না—মাধ্যাকর্ষণ ধর্ম্মে একত্র জমাট বেঁধে নীহারিকা-স্তূপের মধ্যেই ছুটাছুটি করে' বেড়ায়। প্রতি নীহারিকাই বিশেষ একটি মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে অল্পবিস্তর আবর্ত্তনশীল। মাধ্যাকর্ষণ এবং আবর্ত্তনের ফলে নীহারিকাগুলি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হ'তে থাকে। এই প্রকার সঙ্কোচনে অণুসমূহের ছুটাছুটির স্থান ক্রমশঃ কমে' আসে এবং তারা একে অপরের সহিত ধাক্কা খেতে আরম্ভ করে। অণুর গতি এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হ'লে তা' তাপশক্তিতে পর্য্যবসিত হ'য়ে যায়। চতুর্দ্দিক হ'তে যত বেশী পদার্থ এসে একত্র জড় হয়, অভ্যন্তরে তত চাপ পড়ে, এবং তার ফলে অভ্যন্তরের গুরুত্ব যেমন বাড়ে, তাপমাত্রাও ক্রমশঃ তেমনি বেড়ে চলে। গতিশীল অনন্ত অণুর সন্নিবেশে অপরিসীম তাপের উৎপত্তি হয়। দিগন্তবিস্তৃত নীহারিকা সঙ্কোচনদ্বারা এইরূপ অসীম তেজোময় গুরুপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

নীহারিকাগুলি আবর্ত্তনশীল। মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তনের জন্য ইহারা ক্রমে বর্ত্তুল আকার প্রাপ্ত হয়। আবর্ত্তনশীল পদার্থ সঙ্কুচিত হ'লে তার আবর্ত্তনের বেগ বাড়ে। নীহারিকা ক্রমান্বয়ে যত বেশী সঙ্কুচিত হয়, ইহার আবর্ত্তনবেগও তত বৃদ্ধি পায়। নীহারিকার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি অণুগুলিকে নীহারিকা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'তে না দিয়ে টেনে রাখে, এদিকে কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি (Centrifugal force) তার বিষুবপ্রদেশের অণুগুলিকে দূরে নিক্ষেপ কর্তে

চায়। অতি দ্রুত আবর্ত্তনে নীহারিকার এই কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি তার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। চলন্ত গাড়ীর ভিজা চাকা হ'তে জলবিন্দু যেমন বাইরে ছিট্‌কে পড়ে, কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করলে নীহারিকার বিষুববৃত্ত হ'তেও ঠিক সেইরূপ তেজোময় পিণ্ড চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। এই সকল বিক্ষিপ্ত পিণ্ড নীহারিকার কাছে ক্ষুদ্র জলবিন্দুর ন্যায় হ'লেও পৃথিবীর তুলনায় ইহারা লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। ইহাদেরই আমরা মহাকাশে জ্বলন্ত নক্ষত্ররূপে দেখ্‌তে পাই। সূর্য্যও কোন এক সুদূর অতীতে কোন একটা নীহারিকা হ'তে এইভাবে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়েছিল।

সূর্য্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা ৬০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড্ ও আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ৪০,০০০,০০০ ডিগ্রী। প্রায় সকল নক্ষত্রেরই বাইরের ও ভিতরের তাপমাত্রা এইপ্রকার। আলোকবিশ্লেষণ (Spectroscopy) প্রভৃতি পরীক্ষার ফল দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, নক্ষত্রদের উপরিভাগ হ'তে ভিতরের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে যত বেশী, নাক্ষত্রিক পদার্থও তত সূক্ষ্মতর অবস্থায় বিভক্ত হ'তে থাকে। কেন্দ্রের দিকে অণুগুলি ক্রমশঃ পরমাণুতে ও পরমাণুসমূহ প্রোটন-ইলেকট্রণে (Protons and Electrons) পরিণত হ'য়ে যায়। ইলেকট্রণ-প্রোটন অবিশ্রান্তই অতি দ্রুত গতিশীল। প্রতিমুহূর্ত্তে সংখ্যাতীত ইলেকট্রণ-প্রোটনের সম্মিলনে বা সংঘর্ষে যে অসীম তেজ উৎপন্ন হয়, সেই তেজেই নক্ষত্রগণ এত জ্যোতির্ম্ময়। কোটি যুগ ধরে' অমিত তেজ বিকিরণ করবার পরে এখনও আরও কোটি যুগের সঞ্চয় তাদের আছে।

৩৭ নং চিত্র—লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ
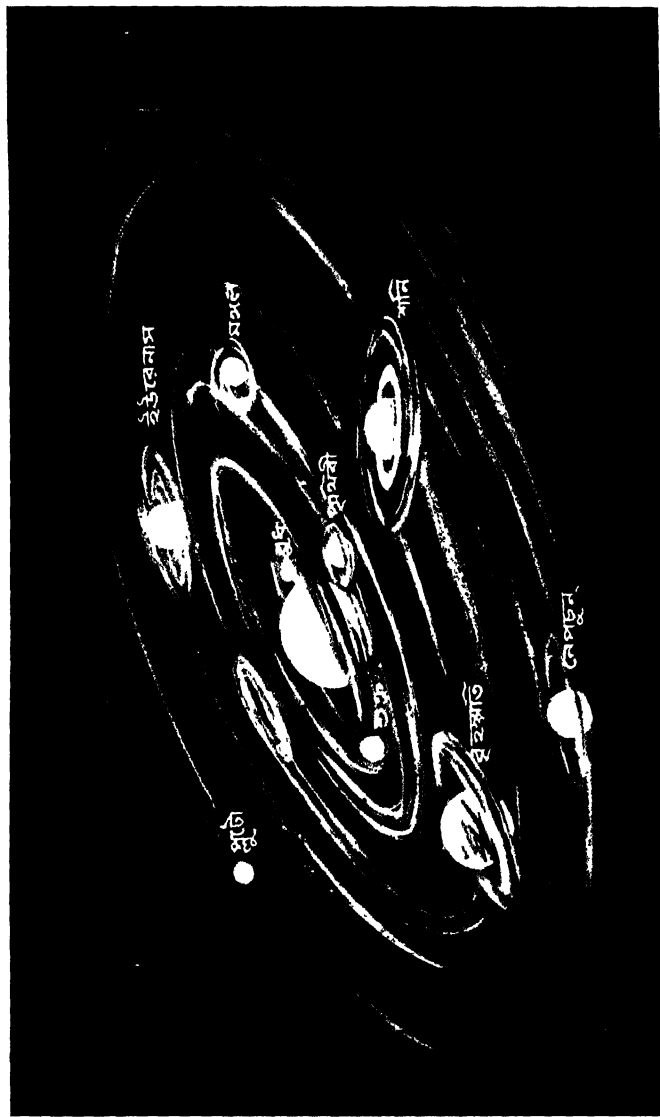
কতকগুলি গ্রহ-উপগ্রহ ও সূর্য্যকে নিয়ে সৌরজগৎ। উপগ্রহগুলি গ্রহের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে, গ্রহগণ আপন আপন উপগ্রহদের নিয়ে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য একদিন ছিল সৌর-জগতের নিঃসঙ্গ একক অধিবাসী, এবং পরে তার অংশেই গ্রহ উপগ্রহের জন্ম হ'ল।

গ্রহ উপগ্রহদের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে কাণ্ট্ (Kant) গ্রহজন্মের এক ইতিবৃত্ত অনুমান করেন। পরে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে লাপ্লেস (Laplace) গ্রহদিগের যে জন্ম-বিবরণ রচনা করেন তা' কাণ্টের মীমাংসারই উন্নত সংস্করণ। লাপ্লেসের এই অনুমান নীহারিকাবাদ নামে প্রসিদ্ধ। লাপ্লেস বলেন, নীহারিকা হ'তে যেমন নক্ষত্রের জন্ম, গ্রহগণও ঠিক সেই ভাবে সূর্য্য হ'তে সৃষ্ট হয়েছে। অত্যধিক আবর্ত্তনে সূর্য্যের বিষুব-বৃত্তের চারিদিকে কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিদ্বারা যে সকল বাষ্পীয় অণু বেরিয়ে আসে, তারা একত্র জমাট বেঁধে এক একটি গ্রহের উদ্ভব হয়েছে ( ৩৪নং চিত্র )। উপগ্রহগণও গ্রহের দেহ হ'তে এই ভাবেই সৃষ্ট হয়েছে। তার পর গ্রহ-উপগ্রহগুলি ক্রমশঃ শীতল হ'য়ে এখনকার তাপমাত্রায় পৌছেছে। আবর্ত্তনের জন্য তাদের আকৃতি প্রায় বর্ত্তুল, মেরুপ্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা। দীর্ঘকাল লাপ্লেসের এই মত চলে আস্ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ইহা নির্ভুল নয়।

প্রথমতঃ, সূর্য্যের মেরুপ্রদেশ চাপা নয়—এবং ইহার বিষুববৃত্তও ফেঁপে ওঠেনি। এর থেকে বোঝা যায়, মেরুদণ্ডের চারিদিকে সূর্য্যের আবর্ত্তন বেশ ধীর। গ্রহগণের যে বয়স, ততদিনে সূর্য্য নিশ্চয়ই কতকটা সঙ্কুচিত হয়েছে। সুতরাং সূর্য্যের এখন যে

আবর্ত্তন, • ততদিন পূর্ব্বে আবর্ত্তনবেগ আরো কম ছিল। সূর্য্যের এখনকার আবর্ত্তনবেগও এত অল্প, যে, ইহার বিষুববৃত্ত হ'তে কোন বাষ্পরাশি অপসৃত হ'তে পারে না। আবর্ত্তন যখন আরো কম ছিল, তখন সূর্য্যদেহ হ'তে গ্রহের উৎপত্তি হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিতে সূর্য্যের বিষুবপ্রদেশ হ'তে বাষ্পকণার বিচ্ছেদ সম্ভব হ'লেও তার দ্বারা গ্রহজন্মের বৃত্তান্ত সমর্থন করা যায় না। দ্রুত আবর্ত্তনে কোন নক্ষত্রের বিষুবপ্রদেশ হ'তে যে কোন একসময়ে যত বাষ্প বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে, তার মধ্যে অণুর সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত নয়। এই অপ্রচুর বাষ্পকণার সম্মিলিত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি ইহাদের ভ্রমণবেগ অবরোধ করতে পারে না। সুতরাং নক্ষত্র হ'তে বিক্ষিপ্ত হ'বার অব্যবহিত পরেই ঐ বাষ্পরাশি মহাকাশে মিলিয়ে যায়। দীর্ঘকাল ধরে' কোন নক্ষত্র হ'তে যে পরিমাণ বাষ্পীয় অণু নির্গত হয়—তা একত্রে বহু গ্রহের জন্ম দিতে পারে, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে নিষ্ক্রান্ত অণুদের জন্য ব'সে অপেক্ষা করার অবকাশ পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির নাই। তারা নক্ষত্র হ'তে যেমন ক্রমে ক্রমে নির্গত হয়, তেমনি ক্রমে ক্রমে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে। কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন বাষ্পরাশির অণুসংখ্যা একত্র জমাট বাঁধবার মত প্রচুর হয় না। নীহারিকা হ'তে বিক্ষিপ্ত অণু ও নক্ষত্র হ'তে বিক্ষিপ্ত অণু—উভয়ের সংখ্যার তারতম্যের জন্য ফলেরও বিরাট প্রভেদ। নীহারিকা হ'তে বিচ্ছিন্ন বাষ্প নক্ষত্রের জন্ম দিতে পারে, কিন্তু নক্ষত্র হ'তে বিচ্ছিন্ন বাষ্পের সমষ্টিবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণে দেখা যায়, অতি দ্রুত

আবর্ত্তনের জন্য নক্ষত্র যদি ভাঙ্গে, তবে তা' দুই প্রায় সমায়তন খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে যায়। ইহাদের একটিকেও গ্রহ বলা চলে না। এক্ষেত্রে একটি নক্ষত্র ভেঙ্গে দুইটি নক্ষত্র হয়, এবং উভয়ে উভয়ের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে। আকাশে এইরূপ অনেক যুগল নক্ষত্র আছে। যুগল নক্ষত্রের প্রত্যেকটিই আবার দ্রুত আবর্ত্তনে ভেঙ্গে গিয়ে অন্যান্য যুগলের সৃষ্টি করতে পারে।

এই সকল কারণে লাপ্লেসের নীহারিকাবাদ দ্বারা নক্ষত্রের জন্ম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু গ্রহের জন্ম নয়।

সৌরজগতের জন্ম সম্বন্ধে অপর একজাতীয় মতবাদ আছে। সূর্য্য একা গ্রহ-সৃষ্টি করতে পারে না বলে' এই সকল সিদ্ধান্তে সূর্য্য-সন্নিধানে অপর এক জ্যোতিষ্কের আগমন কল্পনা করা হয়েছে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই প্রকার মতবাদের জন্মদাতা বাফন (Buffon) সূর্য্যের সহিত একটি ধূমকেতুর সংঘর্ষ কল্পনা করে' সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিকার্টন (Bickerton) বলেন, সূর্য্যের সহিত ধূমকেতুর সংঘর্ষ হয়নি, হয়েছিল অন্য একটি নক্ষত্রের।

বাফন-বিকার্টনের মত অবলম্বনে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে চেম্বারলেন (Chamberlain) ও মুল্টন (Moulton) গ্রহজন্মের মূলে অপর একটি কারণ অনুমান করেন। তাঁরা বলেন, একটি নক্ষত্র ভ্রমণ করতে করতে সূর্য্যের নিকটে এসে পড়ে। তার আকর্ষণে সূর্য্যের উপর উত্তুঙ্গ ঢেউ ওঠে। জলে ঢেউ উঠলে তার চূড়া হ'তে যেমন বিন্দু বিন্দু জল ছিটকে পড়ে, সূর্য্যপৃষ্ঠের ঢেউয়ের চূড়া হ'তেও সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পপিণ্ড বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ল।

চেম্বারলেন ও মুণ্টন এই ক্ষুদ্র পিণ্ডগুলিকে প্লানেটিসিম্যাল্ (Planetisimal) বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ বলেছেন। ইহারাই একত্র জড় হ'য়ে কালে এক একটি বৃহৎ গ্রহ-উপগ্রহে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেছে। চেম্বারলেন-মুণ্টনের এই অনুমান প্লানেটিসিম্যাল হাইপথেসিস্ (Planetisimal Hypothesis) নামে প্রসিদ্ধ।

বাফন-বিকার্টন, চেম্বারলেন-মুণ্টন, সকলেই আপন আপন মতের স্বপক্ষে অনেক কারণ ও প্রমাণ দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই সকল মতবাদ বেশীদিন চল্‌তে পার্‌ল না।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ (Sir James Jeans) প্রমাণ করেছেন, উপযুক্ত কারণ ঘট্‌লে নাক্ষত্রিক বাষ্পসাগরে এমন স্রোত উপস্থিত হ'তে পারে যে, তা' হ'তেই গ্রহ উপগ্রহাদির জন্ম সম্ভব। তাঁর মতবাদ টাইডাল থিওরী (Tidal Theory) নামে অভিহিত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানজগৎ গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি সম্বন্ধে জীন্‌সের মতকে সমর্থন করে।

জীন্‌স্ বলেন, প্রায় দুইশতকোটি বৎসর হ'য়ে গেল, একটি বিরাটকায় নক্ষত্র মহাশূন্যে ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে সূর্য্যের সমীপে এসে পড়ে। সূর্য্য ও ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্রটির সান্নিধ্য যত বাড়্‌তে লাগ্‌ল, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবও উভয়ের উপর তত প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। মাধ্যাকর্ষণের ধর্ম্ম এই যে, কোন জড়বস্তু অপর একটি জড়বস্তুকে সমষ্টিভাবে আকর্ষণ করে না, একটির প্রতি কণা অপরটির প্রতি কণাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আকর্ষণ করে। এই কারণে বস্তুদ্বয়ের যে সকল কণা পরস্পরের যত কাছে, তাদের মধ্যে আকর্ষণের মাত্রাও তত বেশী। এস্থলে সূর্য্য এবং বৃহৎ

নক্ষত্রটি পরস্পরকে আকর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু সেজন্য সমগ্র নক্ষত্রপিণ্ড ও সমগ্র সূর্য্যপিণ্ড একে অন্যের দিকে অগ্রসর হ'ল না। একের বাষ্পকণিকাগুলি অন্যের যত নিকটতর, তারাই তত অধিকতর বলে আকৃষ্ট হ'ল। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবীর সাগরজলে যেমন জোয়ার ঘটে, সূর্য্য এবং ঐ নক্ষত্রের আকর্ষণ-ফলে তাদের উভয়ের বাষ্পসাগরও তেমনি উভয়ের দিকে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। নক্ষত্র দুইটিরই পৃষ্ঠে পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউয়ের আবির্ভাব হ'ল। কিন্তু আগন্তুক নক্ষত্রটি সূর্য্য অপেক্ষা অনেক ভারী, সেজন্য তার আকর্ষণে সূর্য্যপৃষ্ঠে যে উত্তাল তরঙ্গ উঠ্‌ল, সূর্য্যের আকর্ষণে নক্ষত্র পৃষ্ঠের আলোড়ন সেই তুলনায় নগণ্য।

সূর্য্যের উপরিভাগের বাষ্পতরঙ্গ তার গগন স্পর্শ কর্‌ল। তরঙ্গটি প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য হ'তে নক্ষত্রের অভিমুখে প্রবাহিত বাষ্পকণার স্রোত। নক্ষত্রটি ক্রমে যত নিকটতর হ'ল, সূর্য্যপৃষ্ঠের বাষ্পরাশিও তত উর্দ্ধে উঠ্‌ল, এবং অবশেষে তা' স্রোতোবেগে শূন্যপথে নক্ষত্রের দিকে অগ্রসর হ'তে আরম্ভ কর্‌ল (৩৫নং চিত্র)। স্রোতের এই বাষ্পকণাগুলি সূর্য্যের আকর্ষণ উপেক্ষা করে' আগন্তুক নক্ষত্রের মহত্তর আকর্ষণে তার দিকে ধাবিত হ'ল। দূরত্ব যখন সর্ব্বাপেক্ষা কম হ'ল, তখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক বাষ্পকণা সূর্য্যপৃষ্ঠ ত্যাগ ক'রে ঐ প্রবাহে মিশ্‌ল। নক্ষত্রটির অবিশ্রান্ত আকর্ষণে বাষ্পস্রোতটি হ'ল অবিচ্ছিন্ন।

তারপরে একদিন আপন কক্ষে নক্ষত্রটি ক্রমে দূরে সর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। সূর্য্য হ'তে উদ্গত বাষ্পকণার সংখ্যাও সেজন্য ক্রমশঃ হ্রাস পেল। এই ভাবে ঐ বাষ্পস্রোতটির গঠন হ'ল কলার

মোচা বা টরপেডোর মত, মধ্যাংশে মোটা দুইপাশে ক্রমান্বয়ে সরু। অবশেষে নক্ষত্র যখন আরো দূরে চলে গেল, তখন তার
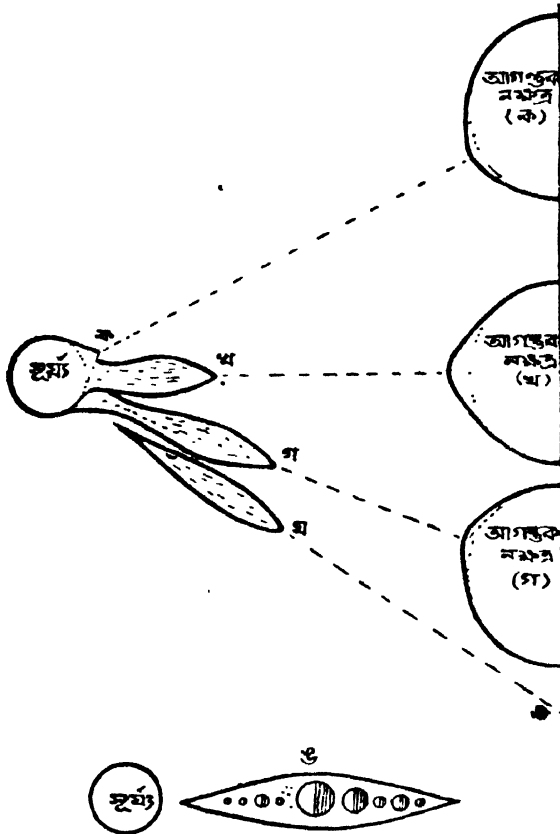
৩৫নং চিত্র—গ্রহের জন্ম (জীন্‌সের মতবাদ)

আকর্ষণে সূর্য্যের উপর যে ঢেউ রইল, তা' খুব বেশী উচ্চে

উঠ্‌তে পারল না; সুতরাং পূর্ব্বেকার বাষ্পস্রোত এখন সূর্য্যদেহ হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়্‌ল। এই বিচ্ছিন্ন বাষ্পপুঞ্জের উপর সূর্য্য ও আগন্তুক নক্ষত্র উভয়েরই আকর্ষণ বর্ত্তমান রইল। নক্ষত্রের আকর্ষণ অতিক্রম ক'রে সূর্য্য বাষ্পকণাগুলিকে নিজদেহে ফিরিয়ে নিতে পারল না। এইরূপে দুই বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণের সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে টরপেডোর আকারে স্তূপীভূত এক সুদীর্ঘ বাষ্পবাহু মহাশূন্যে ভেসে চল্‌ল।

এই বাষ্পপুঞ্জটি একত্র জমাট না বেঁধে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ স্তূপে বিভক্ত হ'য়ে যায়। বিভিন্ন স্তূপগুলিই কালক্রমে ঘনীভূত হ'য়ে এখনকার গ্রহ নামে অভিহিত হয়েছে। এই সকল বাষ্পীয় গ্রহ সূর্য্যের আকর্ষণে তার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু বৃহত্তর নক্ষত্রটির তখনও যে আকর্ষণ সৌরজগতে বর্ত্তমান, তার ফলে এ পিণ্ডগুলির ভ্রমণকক্ষের কোন সঠিক নির্দ্দেশ থাকতে পারল না। পরে নক্ষত্রটি আরো দূরে চলে গেলে সৌরজগৎ যখন সম্পূর্ণরূপে তার আকর্ষণের প্রভাব হ'তে মুক্ত হ'ল, তখন সূর্য্যের চারিদিকে বাষ্পপিণ্ডগুলির ভ্রমণকক্ষও কতকটা নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেল।

নক্ষত্রের আগমনে সূর্য্যদেহের চতুর্দ্দিক হতেই কিছু কিছু বাষ্প নির্গত হয়েছিল—তা মেঘের মত সারা সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়্‌ল। সাধারণ অবস্থায় গ্রহদের ভ্রমণপথ বৃত্তাভাস ( Ellipse ) হওয়া উচিত, কিন্তু সৌরজগতের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত বাষ্পীয় মেঘসমুদয় গ্রহদের যে বাধা প্রদান করে, তাতে তাদের গতিকক্ষ অনেকটা বৃত্তাকারে পরিণত হ'য়ে যায়। গ্রহগণ চলার পথে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল মেঘখণ্ডকে আকর্ষণ করে নিয়ে আপন আপন দেহবৃদ্ধি করতে থাকে।

সূর্য্যদেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন বাষ্পপিণ্ডের প্রথম ও শেষভাগে অণুর সংখ্যা কম থাকায় ইহার গঠন হয়েছিল টরপেডোর মত—মধ্যভাগে মোটা, দুইদিকে ক্রমান্বয়ে সরু। সুতরাং ইহা যখন কতকগুলি স্তূপে বিভক্ত হ'য়ে পড়্‌ল, মধ্যভাগের পিণ্ডদের আয়তন অপেক্ষা দুইপাশের পিণ্ডদের আয়তন ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হ'ল। গ্রহসারির মধ্যস্থলের বৃহস্পতি-শনি অপেক্ষা দুই পার্শ্বের বুধ-শুক্র, ইউরেণাস্‌-নেপচুন প্রভৃতি এইজন্যই আয়তনে ক্ষুদ্রতর। প্রান্তের স্তূপসমূহে অণুসংখ্যা কম বলে' তারা শীঘ্রই তেজ বিকিরণ করে' দিয়ে শীতল হ'তে পারে, সেজন্য ঐ সকল গ্রহও জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বা তার অল্প পরে বায়ব হ'তে তরল ও তরল হ'তে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। প্রান্তবর্ত্তী বুধ ও শুক্র কঠিন, পৃথিবীর কতক কঠিন, কতক তরল, অপর প্রান্তে প্লুটো-নেপ্‌চুনেরও এইরূপ অবস্থা; কিন্তু মধ্যভাগের বৃহস্পতি-শনি এখনও বায়ব অবস্থায় রয়ে গেছে।

আদিম অবস্থায় গ্রহদের ভ্রমণকক্ষের কোন সঠিক নির্দ্দেশ ছিল না। চলার পথে যখনই যে বাষ্পময় গ্রহ সূর্য্যের নিকটে এসে পড়েছে, তখনই তার দেহ হ'তে উপগ্রহ-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বহির্জগতের নক্ষত্রটি যেমন সূর্য্যপৃষ্ঠে এক বাষ্পস্রোত টেনে তুলেছিল, বাষ্পীয় গ্রহগণও সূর্য্যের সন্নিধানে আসায় সূর্য্য তাদের দেহ হ'তে ঐরূপ বাষ্পস্রোত টেনে তোলে। সূর্য্যের বাষ্পবাহু হ'তে যেমন গ্রহদের জন্ম, গ্রহদের বাষ্পবাহু হ'তেও তেমনি উপগ্রহদের জন্ম হয়েছে।

একটি গ্রহ ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গেছে। এই টুক্‌রো-

গুলোকে একত্রে এষ্টারয়েড্‌স্‌ ( Asteroids ) বলা হয়। বৃহস্পতির একপাশে এষ্টারয়েড্‌স্‌, অন্যপাশে শনি। গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতি ও শনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—ইহাদের উপগ্রহসংখ্যাও সবচেয়ে বেশী। আয়তনের এই ক্রম অনুসারে মঙ্গল ও ইউরেণাসের যত বড় হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে ইহারা তদপেক্ষা অনেক ছোট। সুদীর্ঘকাল বায়ব অবস্থায় থাকার ফলে ইহারা ইহাদের অনেক বাষ্পই শূন্যে হারিয়ে ফেলে ক্ষুদ্রকায় হ'য়ে পড়েছে। বুধ ও শুক্র গ্রহ দুইটি এত ক্ষুদ্র যে, জন্মের পরে কঠিন অবস্থায় আস্‌তে ইহাদের বিলম্ব হয়নি। সূর্য্যের আকর্ষণে ইহাদের পৃষ্ঠদেশ হ'তে কোন বাষ্পস্রোত বিচ্ছিন্ন হ'তে পারেনি বলে ইহাদের কোন উপগ্রহ নাই।

জীন্‌সের টাইডাল থিওরী অনুসারে নবাবিষ্কৃত প্লুটো গ্রহটি পূর্ব্বোক্ত বাষ্পবাহুর যে স্থান অধিকার করে' জন্মেছে, তাতে তার যেরূপ আয়তনাদি হওয়া উচিত প্রকৃতপক্ষে সেইরূপই দেখা যায়। ক্ষুদ্রতাবশতঃ বুধ ও শুক্রের যেমন কোন উপগ্রহ জন্মিতে পারে নি, ক্ষুদ্রকায় প্লুটোরও বোধ হয় তেমনি কোন উপগ্রহ-সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। টাইডাল থিওরীর পরিকল্পনা এই নূতন গ্রহটির দ্বারাও এইরূপে সমর্থিত হওয়ায় সৌরজগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে জীন্‌সের ঐ মতবাদ আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উঠেছে।

# একাদশ অধ্যায়

## নক্ষত্র

### নক্ষত্র ও সূর্য্য

নক্ষত্রময় নীল নভঃ মানবের চির আনন্দের বস্তু। সূর্য্যের সহিত আমাদের কতকটা পরিচয় আছে—যদিও সূর্য্যমণ্ডলে যাবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমাদের অক্ষমতা বুঝেই যেন সূর্য্যদেব ৯ কোটি ২৭ লক্ষ মাইল দীর্ঘ জ্যোতির্ম্ময় তাপরশ্মিদ্বারা আমাদের স্পর্শ করে' থাকেন। তাঁর তাপ ও আলোক পেয়ে জীবজগৎ বাঁচে এবং প্রকৃতি নিত্য নূতন রূপসজ্জা গ্রহণ করে। সূর্য্যদেবের জ্যোতির ঔজ্জ্বল্যও অপরিসীম। যে তাপ ও আলোক সূর্য্যদেহ হ'তে বিকীর্ণ হয়, পৃথিবী পায় মাত্র তার ২০০ কোটি ভাগের এক ভাগ! শুধু পৃথিবীকে নয়, ৩৭০ কোটি মাইল দূরবর্ত্তী প্লুটো গ্রহকেও তিনি অনুরূপ রক্ষা করেন। তাঁর মহাকর্ষণে গ্রহ-উপগ্রহ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ভ্রমণ করে; এমন কি ভিন্ন জগতের অধিবাসী বৃহদায়তন ধূমকেতুগুলিও তাঁর অসাধারণ শক্তির নিকট পরাজিত হ'য়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে।

কিন্তু শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়, রাত্রিকালে গগনমণ্ডলে যে সকল অসংখ্য নক্ষত্র অবস্থান করে, আমাদের সূর্য্য তাদেরই মত অতি সাধারণ একটি নক্ষত্র। অনেক নক্ষত্রই সূর্য্য হ'তেও অনেক বড়। তারা সূর্য্য অপেক্ষা বহুদূরে অবস্থিত ব'লে আমরা তাদের অত ক্ষুদ্র দেখি।

আমাদের সূর্য্য, তার নয়টি গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি নিয়ে সৌর-জগৎ। অনেক নক্ষত্রেরই ঐরূপ গ্রহউপগ্রহসমন্বিত বিভিন্ন জগৎ থাকা সম্ভব। বৃহত্তর নক্ষত্রগুলির জগৎ সৌরজগৎ হ'তেও আরো কত বৃহৎ হ'বে তা-ও অনুমেয়। তা'ছাড়া, আমরা দেখি সূর্য্য হ'তে নক্ষত্রসকল বহুদূরে অবস্থিত; প্রতি নক্ষত্রই এইরূপ দূরে দূরে অবস্থিত। চক্ষুদ্বারা আমরা যত নক্ষত্র দেখ্‌তে পাই, সাধারণ একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা অন্ততঃ তার ৮।৯ গুণ দৃষ্টিপথে আসে। তারপর, এই দৃশ্যমান নভোমণ্ডলের বহির্দ্দেশেও অন্যান্য নক্ষত্র-জগৎ আছে—মাঝে মাঝে এক একটি নূতন নক্ষত্র দূরবীক্ষণের দৃষ্টিতে এসে তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। ব্রহ্মাণ্ড কত বিশাল যে, এত নক্ষত্র বিরলভাবে তার কোলে ভাসমান রয়েছে?

আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। এক-বৎসরে আলোকরশ্মি যতদূর ( ১৮৬০০০ × ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ × ২৪ × ৬০ × ৬০ = ৫৮৬৯৭১৩৬০০০০০ মাইল ) যেতে পারে তাকে আলোকবর্ষ বলে। সূর্য্য হ'তে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র ৪$\frac{১}{২}$ আলোকবর্ষ দূরে অব-স্থিত। আজ সে যে রশ্মি বিকীরণ করছে, তা' পৃথিবী দেখ্‌তে পাবে ৪$\frac{১}{২}$ বৎসর পরে, আজ যদি হঠাৎ সে নিভে যায়, তা-ও পৃথিবী জান্‌তে পার্‌বে ৪$\frac{১}{২}$ বৎসর পরে। ধ্রুবতারা হ'তে পৃথিবীতে আলোকরশ্মি আস্‌তে ৪৭ বৎসর অতিবাহিত হ'য়ে যায়।

## নক্ষত্রপুঞ্জ

প্রতিদিন আকাশের তারাগুলিকে লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যায়, স্থানে স্থানে কতকগুলি করে' নক্ষত্র দলবদ্ধ হ'য়ে আছে। এই দলবদ্ধ-

নক্ষত্রগুলিকে নক্ষত্রপুঞ্জ বলে। আকাশে এইপ্রকার অনেক নক্ষত্র-পুঞ্জ আছে।

প্রতি নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলি রেখাদ্বারা যুক্ত কর্‌লে কোন একটি বিশেষ আকৃতি হয়। আকাশের যেখানেই যেদিন থাকুক না কেন, সেই নক্ষত্রদলের আকৃতির পরিবর্ত্তন কোন সময়েই হয় না। মানুষ পুরাকাল হ'তে সেই আকৃতির সদৃশ কোন পার্থিব বস্তুর নাম অনুসারে পুঞ্জগুলির নামকরণ করেছে। মহাপুরুষগণ মৃত্যুর পর আকাশের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিরাজ করেন, ইহাও অনেকের ধারণা ছিল; তদনুসারেও কতকগুলি নক্ষত্রের নাম দেওয়া হয়েছে। কতকগুলি তারকাপুঞ্জ আবার পুরাণের কয়েকটি গল্পের মূলে রয়েছে।

## রাশিচক্রের নক্ষত্র

মহাদেব-জায়া দক্ষকন্যা সতীর সাতাশ ভগ্নীর সহিত চন্দ্রের বিবাহের গল্প পুরাণে পাওয়া যায়। এই সাতাশ ভগ্নী রাশিচক্রে সাতাশটি নক্ষত্ররূপে বিদ্যমান। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রকেও আমরা রাশি-চক্রে ভ্রমণ কর্‌তে দেখি। সাতাশ দিনে চন্দ্রের ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়, এই কালের এক :এক দিন চন্দ্র তারকারূপিণী এক এক জায়ার নিকটে অবস্থান করেন ( ৩৬নং চিত্র )। এদেশে যাত্রাকালে, পূজা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ও বিবাহাদি সংস্কারে চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করে, তা' জানার প্রয়োজন হয়। এইজন্য অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের নাম আমাদের কারও অপরিচিত নয়।

রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে ২৭টি নক্ষত্র অবস্থান করে। এই

সাতাশটির কতকগুলি একক নক্ষত্র ও কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ। এককই হোক কিংবা পুঞ্জই হোক্, ইহাদের প্রত্যেকটিকেই এক একটি নক্ষত্র বলা হয়। এক এক রাশিতে দুইটি নক্ষত্র ও আর একটির এক-চতুর্থাংশ অবস্থান করে। মেষরাশি হ'তে মীনরাশি
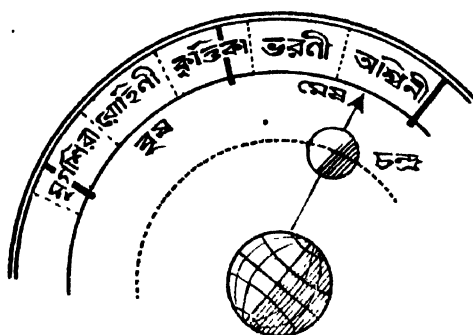
৩৬নং চিত্র—চন্দ্রভোগ্য নক্ষত্র

পর্য্যন্ত নক্ষত্রগুলির নাম—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগ-শিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তর-ফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা,. অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বা-ষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্র-পদা ও রেবতী (৩৭নং চিত্র)।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে, এক এক রাশিতে দুইটি নক্ষত্র ও আর একটির এক-চতুর্থাংশ অবস্থান করে। তদনুসারে প্রতি নক্ষত্রের ব্যাপ্তি হওয়া উচিত রাশিচক্রের ১৩⅓ (৩০ ÷ ২¼) ডিগ্রী। এই ১৩⅓ ডিগ্রী স্থান জুড়ে নক্ষত্রপুঞ্জগুলির অবস্থান সম্ভব হলেও একক নক্ষত্রগুলির জন্য অতখানি স্থানের প্রয়োজন হয় না। আসলে এই

১৩⅓ ডিগ্রী স্থান মানুষকর্ত্তৃক প্রতি নক্ষত্রের রাজ্যের এলাকা বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। চন্দ্র যখন যে নক্ষত্রের এলাকায় প্রবিষ্ট হয় তদবধি পরবর্ত্তী নক্ষত্রের রাজ্যে সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময়কে চন্দ্রের ঐ-নক্ষত্র
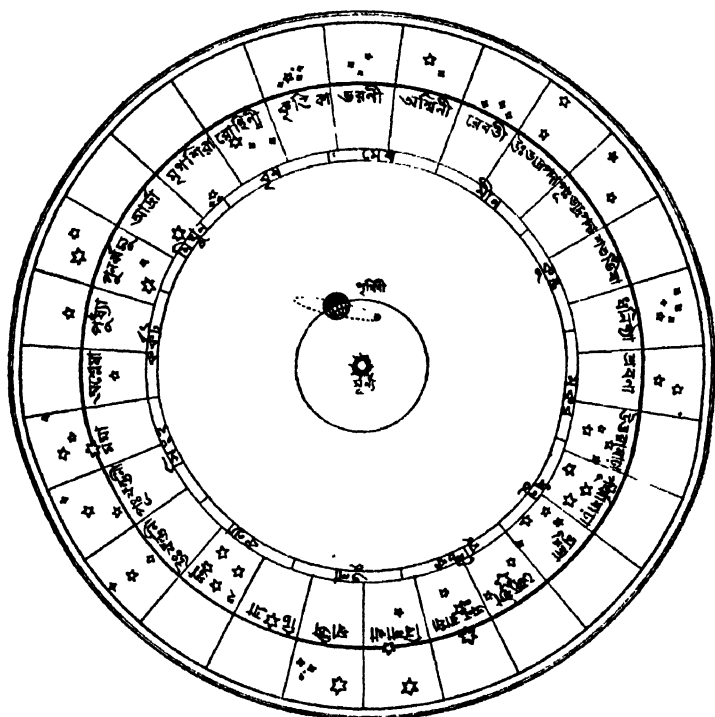
৩৭নং চিত্র—রাশিচক্রের নক্ষত্র

ভোগকাল বলা হয়। মেষরাশিতে সম্পূর্ণ অশ্বিনী ও ভরণী এবং কৃত্তিকার এক-চতুর্থাংশ বা একপাদ আছে। বৃষতে কৃত্তিকার

তিনপাদ, রোহিণী সম্পূর্ণ ও মৃগশিরার দুইপাদ আছে। এইরূপে অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলিও অন্যান্য রাশিগুলির মধ্যে বিভক্ত।

যে মাসের পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে থাকে, তাহা বৈশাখ মাস। সেইরূপ জ্যেষ্ঠা, আষাঢ়া, শ্রবণা, ভাদ্রপদা, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, ফল্গুনী ও চিত্রা নক্ষত্রের নাম অনুসারে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ, (অগ্রহায়ণ), পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের নাম হয়েছে।

মৃগশিরা, আর্দ্রা, মঘা, ফল্গুনীদ্বয়, চিত্রা, স্বাতী, জ্যৈষ্ঠা, আষাঢ়াদ্বয়, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদা একক নক্ষত্র, অবশিষ্ট চৌদ্দটি নক্ষত্রপুঞ্জ।

## প্রসিদ্ধ নক্ষত্র সমূহ

ধ্রুবতারা আকাশের সর্ব্বপ্রধান নক্ষত্র। উত্তরাকাশের ঠিক একই বিন্দুতে ইহা প্রত্যহ স্থির ভাবে অবস্থান করে। পৃথিবীর মেরুরেখা উভয়দিকে বর্দ্ধিত করলে উত্তরাকাশ ও দক্ষিণাকাশের দুইটি বিন্দু স্পর্শ করে। উত্তরাকাশে যে বিন্দুতে স্পর্শ করে, সেস্থানে একটি উজ্জ্বল তারা আছে। পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্থির, তজ্জন্য মেরুরেখাপ্রান্তের নক্ষত্রটিকেও আমরা স্থির দেখি। এই স্থির নক্ষত্রটির নাম ধ্রুবতারা ( Pole Star )।

ধ্রুবতারা উত্তরাকাশের একই বিন্দুতে বৎসরের প্রতিদিন অবস্থান করে। এইজন্য ধ্রুবতারাকে চিনে রাখলে রাত্রিকালে পথ হারাবার ভয় থাকে না। বহু পুরাকাল হ'তেই ধ্রুবতারা পথিক ও নাবিকদের দিক্‌দর্শন যন্ত্রের কাজ করে' আস্‌ছে। সকল দেশেরই প্রাচীন

জ্যোতিষী যে এই নক্ষত্রের সন্ধান রাখ্‌ত, তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

ধ্রুবতারাকে চিন্‌তে হ'লে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে (Great Bear) চেনা প্রয়োজন। ধ্রুবতারা হ'তে কিছুদূরে থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল চব্বিশ

৩৮নং চিত্র—ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষি, কাশ্যপী, অভিজিৎ, ব্রহ্মহৃদয় ও ধ্রুবমৎস্য
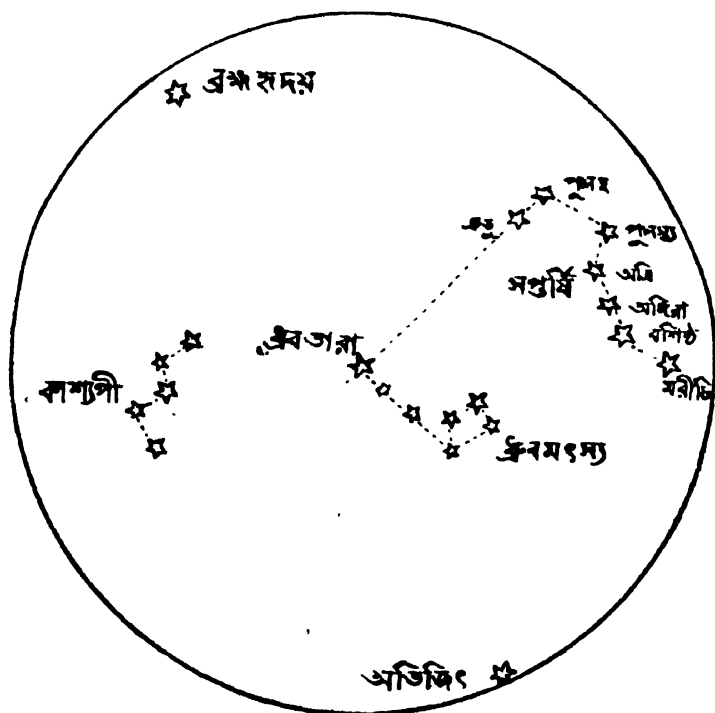
ঘণ্টায় ধ্রুবতারাকে একবার প্রদক্ষিণ করে (৩৮নং চিত্র)। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের জন্য আমরা ইহাই মনে করি। চিত্রের ক্রতু

ও পুলহ নক্ষত্রটি রেখাযুক্ত করে’ বর্দ্ধিত কর্‌লে ধ্রুবনক্ষত্রে পৌঁছান যায়। ধ্রুব নক্ষত্রের পরিচায়ক বলে’ এই নক্ষত্রপুঞ্জটিও বহুকাল হ’তে মানুষের পরিচিত। সপ্তর্ষিমণ্ডলে সাতটি উজ্জ্বল তারা আছে। ভারতবর্ষ ইহার নাম দিয়েছে সপ্তর্ষি,—ক্রতু পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি এই সাতজন ঋষি সপ্তর্ষিমণ্ডলে অহরহঃ ধ্যানমগ্ন। মেসোপটেমিয়া নাম দিয়েছে (Ursa Major) বা বৃহৎ ভল্লুক। এই বৃহৎ ভল্লুক নাম অবলম্বনে আবার গ্রীক পুরাণের একটি গল্প রচিত হয়েছে,—কেমন করে’ জুনোর ঈর্ষ্যাবহ্নি হ’তে বাঁচাবার জন্য জুপিটার ক্যালিষ্টোকে প্রথমে ভল্লুক ও পরে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত করেন।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঠিক বিপরীতদিকে থেকে আর একটি নক্ষত্র-পুঞ্জ ধ্রুবতারাকে ২৪ ঘণ্টায় প্রদক্ষিণ করে, তার নাম কাশ্যপী (Cassiopia)। ইহার আকৃতি ইংরাজী W অক্ষরটির মত (৩৮নং চিত্র)।

ধ্রুবতারার খুব সন্নিকটে ক্ষুদ্র আর একটি প্রদক্ষিণকারী নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, তার নাম ধ্রুবমৎস্য বা শিশুমার (Little Bear)। ধ্রুব-তারার দুইপাশে দুইটি উজ্জ্বল তারা আছে—একটি ব্রহ্মহৃদয় (Capella) ও অপরটি অভিজিৎ (Vega) (৩৮নং চিত্র)।

বৃষ ও মিথুনরাশির মধ্যভাগে কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্রপুঞ্জ অবস্থিত (৩৯নং চিত্র)। প্রসিদ্ধি হিসাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পরেই ইহার স্থান। কালপুরুষ পুরাণের যমরাজ ও বিখ্যাত শিকারী। চিত্রের ১ নক্ষত্রটি (মৃগশিরা) তাঁর মস্তক, ২ (আর্দ্রা), ৩, ১০ ও ১১ (বাণরাজ) নক্ষত্র যমের চারি হস্ত পদ, ৪, ৫ ও ৬ নক্ষত্র

কালপুরুষের কটিবন্ধ এবং ৭, ৮ ও ৯ নক্ষত্র শিকারীর তলোয়ার। ইহার দক্ষিণে দুইপার্শ্বে শিকারীর কুকুর দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আছে,—তাদের নাম লুব্ধক ( Sirius ) ও প্রভাস বা প্রশ্বা ( Procyon )।
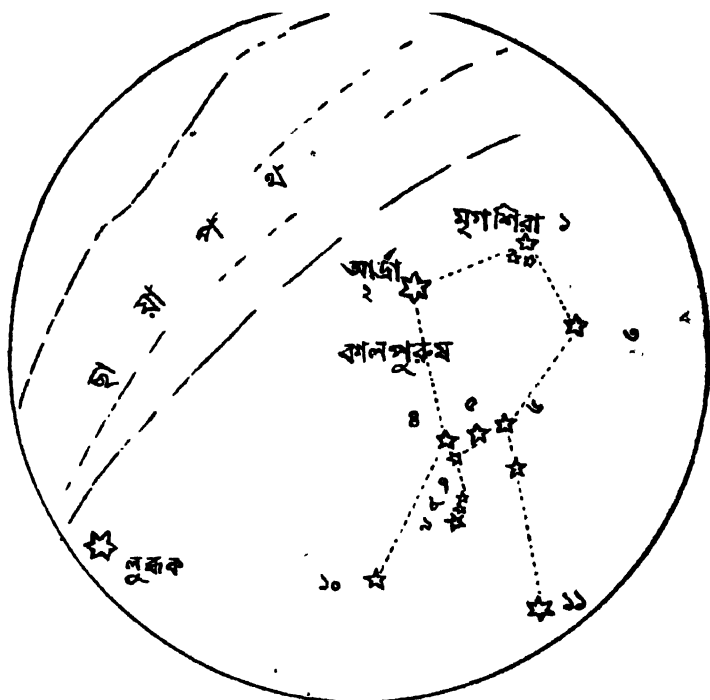
৩৯নং চিত্র—কালপুরুষ ও লুব্ধক

লুব্ধক নক্ষত্রটি আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। একমাত্র বৃহস্পতি গ্রহ ঔজ্জ্বল্যে মাঝে মাঝে ইহার সমতুল হয়।

মেষ ও বৃষরাশির মধ্যবর্ত্তী কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জটিতে স্থূলদৃষ্টিতে

৬।৭টি তারা দেখা যায়। এইগুলি অনেকটা সপ্তর্ষির আকৃতি গঠন করেছে—তবে খুব অল্পস্থানে ঘন-সন্নিবিষ্ট হ'য়ে আছে। এই পুঞ্জটি সাতভাই তারা নামেও প্রসিদ্ধ। পুরাণ এর ৬টি তারকাকে সপ্তর্ষির

৪০নং চিত্র—হ্রদসর্প, লুব্ধক ও প্রশ্বা
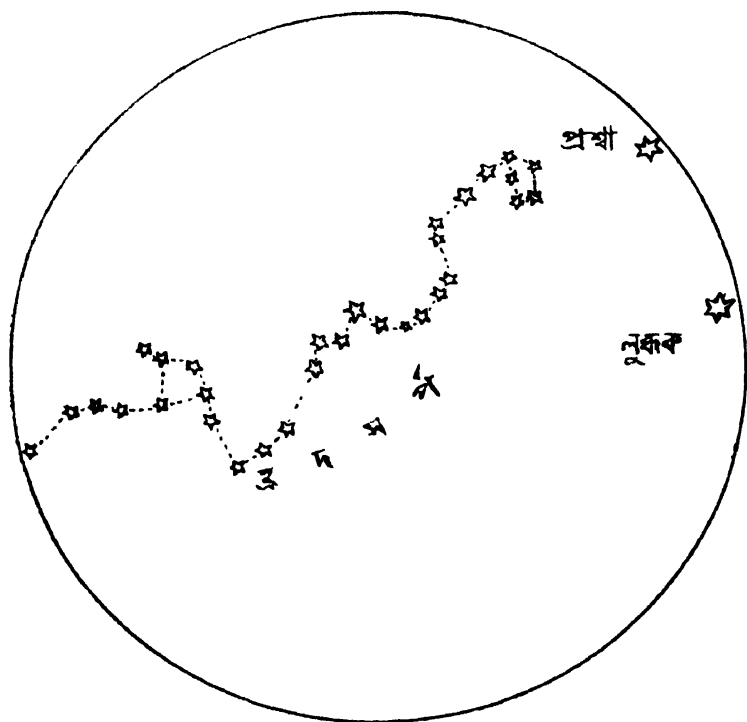
বশিষ্ঠ ভিন্ন অন্য ছয় ঋষির পত্নী কল্পনা করেছে। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী (Alcor) নক্ষত্রটির অবস্থান সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠেরই খুব নিকটে।

লুব্ধকের দক্ষিণদিকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে,—তার নাম অগস্ত্য (Canopus)। তুলারাশির দক্ষিণে একটি সর্পাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। ইহার নাম হ্রদসর্প (Hydra)—পুরাণের অনন্তনাগ বা কালীয় ( ৪০নং চিত্র )। হ্রদসর্পের : পূর্ব্বতম পাঁচটি তারা একত্রে রাশিচক্রের অশ্লেষা নক্ষত্র।

## নক্ষত্রের সংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ

আকাশের কতকগুলি তারা উজ্জ্বল, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল—কতকগুলি ত একেবারে অস্পষ্ট। উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে নক্ষত্রের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। উজ্জ্বলতম নক্ষত্র-গুলিকে প্রথম প্রভার নক্ষত্র বলে। প্রথম প্রভার নক্ষত্রসংখ্যা ২০,* দ্বিতীয় প্রভার ৬৫, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রভার নক্ষত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৫০০, ৫৩০, ১৬২০ ও ৪৮৫০। ভাল চক্ষু ষষ্ঠ প্রভার নক্ষত্র পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বিংশতি প্রভার নক্ষত্র পর্য্যন্ত এযাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। উইল্‌সন্ পর্ব্বতশৃঙ্গের বিখ্যাত দূরবীক্ষণ দ্বারা ১,০০০,০০০,০০০,০০০ একলক্ষ কোটি নক্ষত্র দৃষ্টিপথে এসেছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আরো অধিক শক্তি-সম্পন্ন হ'লে আরো নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে, সন্দেহ নাই।

আয়তন, উজ্জ্বলতা ও দূরত্বের উপর নক্ষত্রের প্রভা নির্ভর

* প্রথম প্রভা নক্ষত্রের নাম :

লুব্ধক, অগস্ত্য, মহিষাসুরের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র দুইটি, স্বাতী, অভিজিৎ, বাণরাজা, ব্রহ্মহৃদয়, প্রশ্বা বা প্রভাস, আর্দ্রা, শূল, রোহিণী, জ্যেষ্ঠা, দক্ষিণ ক্রুশের দুইটি নক্ষত্র, শ্রবণা, চিত্রা, ফোমাল হাউট্, মঘা ও সোমতারা।

করে। পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধানকে যদি একলক্ষগুণ বর্দ্ধিত করা যেত, তা'হলে আমরা লুব্ধক নক্ষত্রটিকে যেরূপ উজ্জ্বল দেখি, সূর্য্যকেও সেইরূপ দেখাত। বাস্তবিকপক্ষে সূর্য্য ও লুব্ধক নক্ষত্রের আয়তন, উজ্জ্বলতা প্রভৃতি প্রায় সমান, শুধু দূরত্বের জন্য তা'কে আমরা ক্ষুদ্র দেখি। আবার এমন নক্ষত্রও আছে, যার আয়তন সূর্য্যের চল্লিশ হাজার গুণ, অথচ দূরত্বের জন্য তা'কে দেখায় পঞ্চম কি ষষ্ঠ প্রভার নক্ষত্রের মত।

## নক্ষত্রের গতি

নক্ষত্রগুলি সূর্য্যের ন্যায় চব্বিশ ঘণ্টায় প্রত্যহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, ইহাই আমরা দেখি। একটু ভাল করে' দেখ্‌লে জানা যায় যে, সকল নক্ষত্রই যেন ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে' ঘুর্‌ছে। ধ্রুবতারা যেন ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা দৈর্ঘ্যের অদৃশ্য রজ্জুদ্বারা সকল নক্ষত্রকে আপন অঙ্গে বন্ধন করেছে ও নক্ষত্রগুলি রজ্জু অবলম্বনে ধ্রুব-তারাকে প্রদক্ষিণ কর্‌ছে। সপ্তর্ষি ও কাশ্যপীর এই প্রদক্ষিণ ত আমরা এখান থেকেই দেখি,—উত্তর মেরুতে গেলে দেখ্‌ব যে' সকল নক্ষত্রই ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে' চব্বিশ ঘণ্টায় ঘুর্‌ছে। আমরা জানি পৃথিবীর মেরুদণ্ডের উপর চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তনের জন্য আমরা নক্ষত্রের এই প্রাত্যহিক ভ্রমণ দেখ্‌তে পাই। মেরুদণ্ডের লক্ষ্য ধ্রুবতারার দিকে, সেজন্য ধ্রুবতারা আমাদের চক্ষে স্থির, এবং সেজন্যই ইহা সকল নক্ষত্রের কেন্দ্র। বাস্তবিকপক্ষে নক্ষত্রগুলি আকাশে স্থিরই থাকে।

ইহা ত গেল সাধারণ ভাবে নক্ষত্রের কথা। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে

দেখ্‌লে জানা যায়, নক্ষত্রেরও গতি আছে। নক্ষত্রগুলি পৃথিবী হ'তে এত দূরে যে, তাদের গতি আমরা সহজে ধর্‌তে পারি না। দুই তিন শতাব্দী বা সহস্র বৎসর পরে কোন কোন নক্ষত্রের স্থানপরিবর্ত্তন বুঝ্‌তে পারা যায়। আমাদের সূর্য্যেরও একটি গতি আছে।

কোন কোন নক্ষত্র সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় ও কোন কোনটি দূরে সরে যায়। সূর্য্যও স্থান ত্যাগ করে' কতকগুলি নক্ষত্রের সম্মুখীন হয়, কতকগুলিকে পশ্চাতে ফেলে।

## বিচিত্র নক্ষত্র

আকাশের প্রতি নক্ষত্রকে স্থূল দৃষ্টিতে একক বলে মনে হয়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখা যায়, প্রায় অর্দ্ধসংখ্যক নক্ষত্রই দুইটি নক্ষত্রের সমষ্টি। ইহাদের যুগল-নক্ষত্র ( Binary ) বলে। জ্যোতির্ব্বিদ্ এইরূপ অনেক যুগল-নক্ষত্রের গতিবিধি লিপিবদ্ধ করেছেন।

যুগল-নক্ষত্রের দুইটি নক্ষত্র একে অপরকে আকর্ষণ করে, সেজন্য উভয়ে উভয়কে প্রদক্ষিণ করে। সপ্তর্ষি মণ্ডলের ষষ্ঠ নক্ষত্র বশিষ্ঠ একটি যুগল-নক্ষত্র। অশ্বিনী নক্ষত্রের নিকটে মায়াবতী (Algol) এবং তুলারাশিস্থ স্বাতীও (Arcturus) যুগল-নক্ষত্র।

কোন কোন নক্ষত্র আবার তিনটি নক্ষত্রের সমষ্টি, কোন কোনটির সঙ্গে চারিটিও আছে।

কতকগুলি নক্ষত্রের প্রভার পরিবর্ত্তন হ'তে দেখা যায়। এই-গুলিকে পরিবর্ত্তনশীল (Variable Stars) নক্ষত্র বলা হয়। মায়াবতী বেশীর ভাগ সময়ে আকাশের একটি দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্র। ২দিন ১১ ঘণ্টা ইহা দ্বিতীয় প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল থাকার পর ৪½ ঘণ্টার

৪২ নং চিত্র — তারকাগুচ্ছ

মধ্যে ইহার প্রভা হ্রাস পেয়ে ক্রমশঃ চতুর্থ-প্রভার নক্ষত্রে পরিণত হয়—আবার ৬½ ঘণ্টার মধ্যে উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হ'য়ে দ্বিতীয় প্রভায় পরিণত হয়।

অভিজিৎ (Vega) নক্ষত্রের নিকটে একটি পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র আছে, তার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের কাল ১২ দিন, ২২ ঘণ্টা। রেবতী (Fishes) নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী মার (Mira) নক্ষত্রের পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ হয় প্রায় এক বৎসরে। এইরূপ প্রায় ৫০০০ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার নিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধির কথা জানা গেছে।

এই সকল পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের একটি বা একাধিক প্রভাহীন সঙ্গী আছে। তাহারা নক্ষত্রগণকে এক একটি বিশিষ্টকালে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রভাহীন সঙ্গীরা নক্ষত্রগণকে অল্পবিস্তর আড়াল করে বলেই আমরা তাদের প্রভার হ্রাসবৃদ্ধি হ'তে দেখি—বস্তুতঃ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা সমভাবেই থাকে।

কতকগুলি যুগল নক্ষত্রও পরিবর্ত্তনশীল। ইহারা যদিও উভয়েই উজ্জ্বল, তথাপি একে যখন অপরের অন্তরালে যায়, তখন আমরা যুগলের অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখি। এইরূপ, কখনও যুগলের একটি ও অপরের কিছু অংশ, কখনও বা দুইটিই সম্পূর্ণ দেখ্‌তে পাই। এইজন্যই ইহাদেরও প্রভার হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

উপরোক্ত নক্ষত্রগুলির প্রকৃতপক্ষে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু এমনও দু' একটি নক্ষত্র আছে যাদের আয়তন ও উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কোন কোন নক্ষত্রের বাষ্পপুঞ্জ হঠাৎ বিস্তৃত হ'তে থাকে। আমরা তখন তা'কে বৃহত্তর ও সেইজন্য উজ্জ্বলতর দেখি। আবার অধিক বিস্তৃত হ'য়ে পড়্‌লে বাষ্পপুঞ্জ আলোক বিকীরণ কর্‌বার

ক্ষমতা হারায়। এইরূপে ক্রমে বহির্ভাগের বিরলবাষ্প আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হ'য়ে পড়ে। তখন নক্ষত্রটি পুনরায় ক্ষুদ্র এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর হ'য়ে যায়। নোভা একুইলে (Nova Acquilae) ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন ঐরূপ হঠাৎ অত্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছিল—কয়েকমাসের মধ্যে পুনরায় সে অস্পষ্ট নক্ষত্রে পরিণত হ'য়ে যায় ( ৪১নং চিত্র )।

# দ্বাদশ অধ্যায়

## ছায়াপথ ও নীহারিকা

অন্ধকার রাত্রে দেখা যায়, একটি আলোকপথ আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে চলে গেছে—যাকে আমরা বলি ছায়াপথ। পুরাণে এই জ্যোতির্ম্ময় পথকে কেউ বলেছে আকাশগঙ্গা বা বৈতরিণী নদী, আবার কেউ বলেছে এই পথ দিয়ে দেবকন্যারা আকাশগঙ্গায় যেতেন, জল আনতে।

ছায়াপথ আকাশকে সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত বৃত্তাকারে বেষ্টন করে' আছে। সেজন্য আকাশ যেন ইহা দ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত হয়েছে। রাশিচক্রকে ছায়াপথ দুইস্থানে ছেদ করে,—একবার বৃষ-মিথুন রাশিতে, আর একবার বৃশ্চিক-ধনুরাশিতে। এই আকাশমার্গটির প্রস্থ সর্ব্বত্র সমান নয়, স্থানবিশেষে ইহার উজ্জ্বলতারও অনেক তারতম্য আছে। সাধারণতঃ মধ্যভাগ উজ্জ্বলতম; কিন্তু কতকস্থানে আবার মনে হয়, মধ্যভাগেই ছায়াপথটি বিভক্ত হ'য়ে গেছে।

৪৩ নং চিত্র—গ্রহরূপী নীহারিকা

ছায়াপথের মধ্যাংশ উজ্জ্বল মেঘসদৃশ, দুইপাশ ক্রমশঃ অনুজ্জ্বল। দূরবীক্ষণ দ্বারা ইহার মধ্যে অগণিত নক্ষত্র, তারকাগুচ্ছ এবং উজ্জ্বল ও প্রভাহীন নীহারিকা দেখা যায়।

ছায়াপথে একলক্ষ কোটি নক্ষত্র আছে। তার প্রায় অর্দ্ধাংশই যুগল-নক্ষত্র, লক্ষে একটি নক্ষত্র হয়ত গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করেছে, অবশিষ্টগুলি একেবারেই একক।

তারকাগুচ্ছ ( Star-cluster ) গুলি নক্ষত্র-সমষ্টি। নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় তা'দের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি নাই—প্রায় সকলগুলিই বৃত্তাকার ( Globular cluster ), কেবল কয়েকটি তারকাগুচ্ছ বৃত্তাকার নয়, কতকটা অনিয়মিতভাবে সম্বদ্ধ। বৃত্তাকার তারকাগুচ্ছগুলির মধ্যস্থলে নক্ষত্রগুলি খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট, বাহিরের দিকের নক্ষত্রসমূহ ক্রমশঃ বিরল-ভাবে অবস্থিত ( ৪২নং চিত্র )। কেন্দ্রীয় নক্ষত্রটিই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল—এবং সকল তারকাগুচ্ছেই প্রায় সমায়তন। কেন্দ্রীয় নক্ষত্রগুলি রেখাযুক্ত করলে দেখা যায় যে, তারা একই বৃত্তাংশের (Arc) উপর অবস্থিত; আকাশের যেখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত নয়। তারকাগুচ্ছগুলি পৃথিবী হ'তে অনেক দূরে,—নিকটতমটি মহিষাসুরের একটি নক্ষত্র ( w Centauri ) ইহার দূরত্ব ২১,০০০ আলোকবর্ষ। হারকিউলস্ তারকাগুচ্ছটি ২৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাদের এক একটি সাধারণ নক্ষত্রের মত দেখায়। ছায়াপথের অন্তর্গত তারকাগুচ্ছের সংখ্যা সত্তরটি। উজ্জ্বল এক একটি গুচ্ছে ৫০,০০০ বা ততোধিক নক্ষত্র আছে। বৃত্তাকার প্রতি গুচ্ছের ঔজ্জ্বল্য অন্ততঃ তিনলক্ষ সূর্য্যের সমতুল, তবুও পৃথিবী হ'তে এক একটি গুচ্ছকে এক একটি সাধারণ নক্ষত্রের মত দেখায়।

ছায়াপথে অসংখ্য নীহারিকা দেখা যায়। তুষার বা ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের নাম নীহার,—ইহা দেখ্‌তে কতকটা তূলা বা ধূমের মত। নক্ষত্রলোকে যে সকল পদার্থকে আমরা নীহারের ন্যায় দেখি, তাদের নীহারিকা বলে। ছায়াপথের বহির্দ্দেশে দৃশ্যমান নক্ষত্র-রাজ্যের পরপারে ধূমসদৃশ জ্যোতিষ্কগণও এযাবৎ নীহারিকা নামেই পরিচিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে জানা গেছে যে, ছায়াপথের নীহারিকাগুলি সেই সকল নীহারিকা হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়। ছায়াপথের অন্তর্গত নীহারিকাগুলি ওজন প্রভৃতিতে প্রায় একটি নক্ষত্রের সমান, কিন্তু বহির্দ্দেশের নীহারিকাগুলি অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি।

ছায়াপথের নীহারিকাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, কতক-গুলি গ্রহরূপী এবং কতকগুলি বিশিষ্ট আকৃতিবিহীন। গ্রহরূপী নীহারিকাগুলির সংখ্যা ১৫০; দূরবীক্ষণে দেখা যায়, ইহাদের সকলের কেন্দ্রেই যেন একটি নক্ষত্র বর্ত্তমান (৪৩নং চিত্র)। বর্ত্তুলাকৃতির জন্য ইহাদের গ্রহরূপী নীহারিকা (Planetary nebulæ) বলা হয়। এক একটি বর্ত্তুলের ব্যাস সত্তর হাজার কোটি মাইলের কাছাকাছি, কিন্তু ওজন প্রভৃতিতে প্রায় সূর্য্যের সমান। ইহাদের মধ্যে বাষ্প খুব হাল্কাভাবে আছে—এক ঘন ইঞ্চি পরিমিত স্থানের বায়ু এক ঘন মাইলে বিস্তৃত হ'লে যে প্রকার হাল্কা হয়, সেইরূপ। ইহাদের কেন্দ্রস্থিত নক্ষত্রটি নীহারিকাগুলিকে উজ্জ্বল করে।

ছায়াপথের অন্তর্গত অপর নীহারিকাগুলিকে আমরা হাল্কা মেঘের মত দেখি—ইহাদের কোন বিশিষ্ট আকৃতি নাই এবং কতকগুলি উজ্জ্বল, কতকগুলি একেবারেই প্রভাহীন। ইহাদের বাষ্প অত্যন্ত বিরল-সন্নিবিষ্ট, সেজন্য ইহারা শীতল। কিন্তু প্রতিবেশী তপ্ত ও

৪৪ নং চিত্র—উত্তরভাদ্রপদানক্ষত্রের সমীপস্থ নীহারিকা
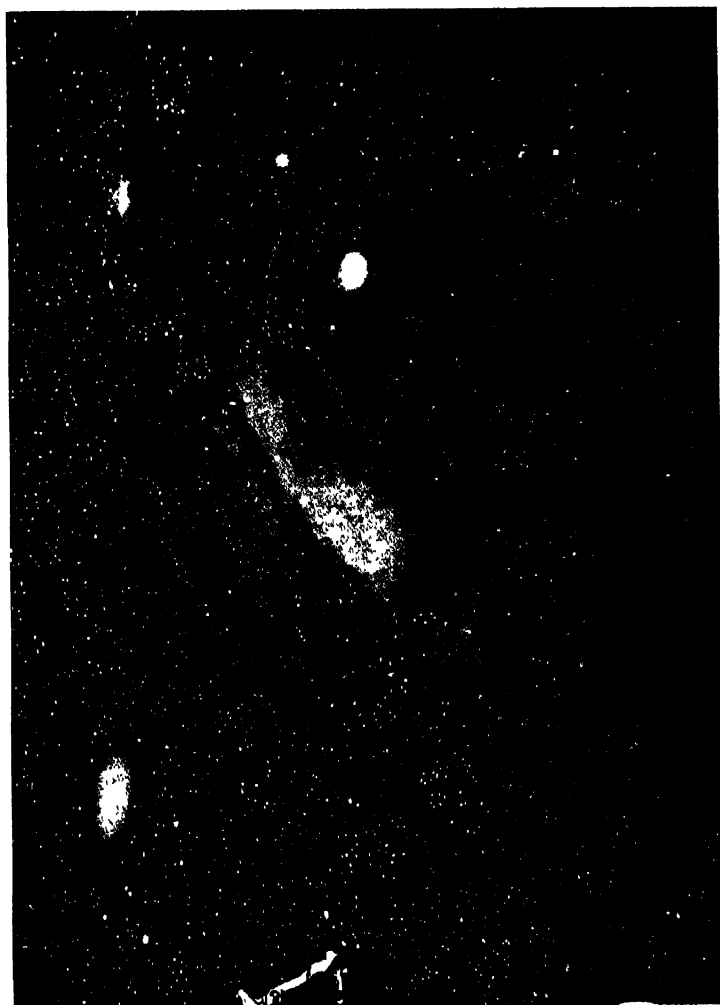
নক্ষত্রের আলোকে ইহারাও তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়, এবং তখন আমরা ইহাদের দেখ্‌তে পাই। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জটিকে এইরূপ হাল্কা নীহারিকাংশ ঘিরে আছে। প্রভাহীন নীহারিকাগুলি ছায়াপথের অনেক উজ্জ্বল অংশকে আবৃত করে' রেখেছে।

মিথুনরাশির নিকটে ছায়াপথটি অনুজ্জ্বল—তার বিপরীত দিকে ধনুরাশির নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, এবং প্রস্থও ধনুরাশিতেই সমধিক।

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## ব্রহ্মাণ্ডে ছায়াপথ

ছায়াপথের বহির্দ্দেশে নক্ষত্রের পরপারের নীহারিকাগুলির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহারা অগণ্য নক্ষত্রসমষ্টি, বহুদূরে অবস্থানের জন্যই আমরা তাদের ধূমসদৃশ দেখি। দূরবীক্ষণ ব্যতীত এই সকল নীহারিকা দেখা যায় না—একমাত্র উত্তরভাদ্রপদা (Andromeda) নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী নীহারিকাটি (M 31) কারও কারও দৃষ্টিতে ধরা পড়ে (৪৪নং চিত্র)। এই নীহারিকাটিই আমাদের নিকটতম। আকাশের যে কোন দিকেই অনুসন্ধান কর্‌লে এই সকল নীহারিকা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। এ পর্য্যন্ত এইরূপ ২০ লক্ষ নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। আশ্চর্য্য এই নীহারিকা-গুলির সন্নিবেশ কোথাও কম, কোথাও বেশী নয়,—ব্রহ্মাণ্ডে ইহারা সর্ব্বত্র প্রায় সমভাবে অবস্থিত।

নীহারিকাগুলির মধ্যস্থল খুব ঘন, এবং তার চতুর্দ্দিকে ক্রমশঃ বিরলভাবে অসংখ্য নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক অবস্থিত। প্রায় সকল নীহারিকাতেই কম্বুরেখাচিহ্ন বর্ত্তমান। কালপুরুষ নক্ষত্রের সমীপবর্ত্তী নীহারিকাটিতে এই চিহ্ন সুস্পষ্ট রয়েছে (৪৫নং চিত্র)। ইহাদের প্রস্থ এবং উচ্চতাও আছে, কিন্তু তা' ইহার দৈর্ঘ্যের তুলনায় অত বৃহৎ নয়। আকারে নীহারিকাগুলি কতকটা ডিম্বের ন্যায়—ইহাদের অধিকাংশেরই দীর্ঘব্যাস অপেক্ষা ক্ষুদ্রব্যাস অনেক ছোট। ক্ষুদ্রব্যাসকে অবলম্বন করে' এই নীহারিকাগুলি আবর্ত্তিত হ'তে থাকে। আবর্ত্তন ভিন্ন ইহারা আবার সেকেণ্ডে প্রায় একহাজার মাইল বেগে আকাশে ভ্রমণ করে।

মহাকাশ প্রায় শূন্য—তারই মাঝে মাঝে এই প্রকার এক একটি ডিম্বাকৃতি নীহারিকার অবস্থান। প্রতি নীহারিকা হ'তেই তার নিকটতম নীহারিকাটির দূরত্ব গড়ে দশলক্ষ আলোকবর্ষ। মহাশূন্য যেন অসীম সমুদ্র। তার মধ্যে বহু দূরে দূরে নীহারিকাগুলি জ্যোতির্ম্ময় দ্বীপের ন্যায় ভাসমান। এইজন্য এই সকল নীহারিকাকে এক একটি বিশ্ব বা দ্বীপজগৎ (Island Universe) বলে। মহাকাশে ভ্রমণ করেল আমরা কোথাও সঙ্গীহীন একক নক্ষত্র বা গ্রহ প্রভৃতি দেখ্‌তে পাব না। প্রত্যি নক্ষত্রই কোন বিশেষ বিশ্বের অধিবাসী।

সূর্য্য যে বিশ্বের অন্তর্গত, ছায়াপথ তার সীমা রেখা। এই বিশ্বটিকে আমরা ছায়াপথ নামে অভিহিত করব। যে সকল নক্ষত্র আমরা মুক্তনেত্রে দেখ্‌তে পাই, তারাও সকলেই ছায়াপথের অন্তর্গত। ছায়াপথও অন্যান্য বিশ্বের ন্যায় একটি দীর্ঘবৃত্তাণ্ড (Ellipsoid)।

৪৫ নং চিত্র —কালপুরুষের সমীপবর্ত্তী নীহারিকা
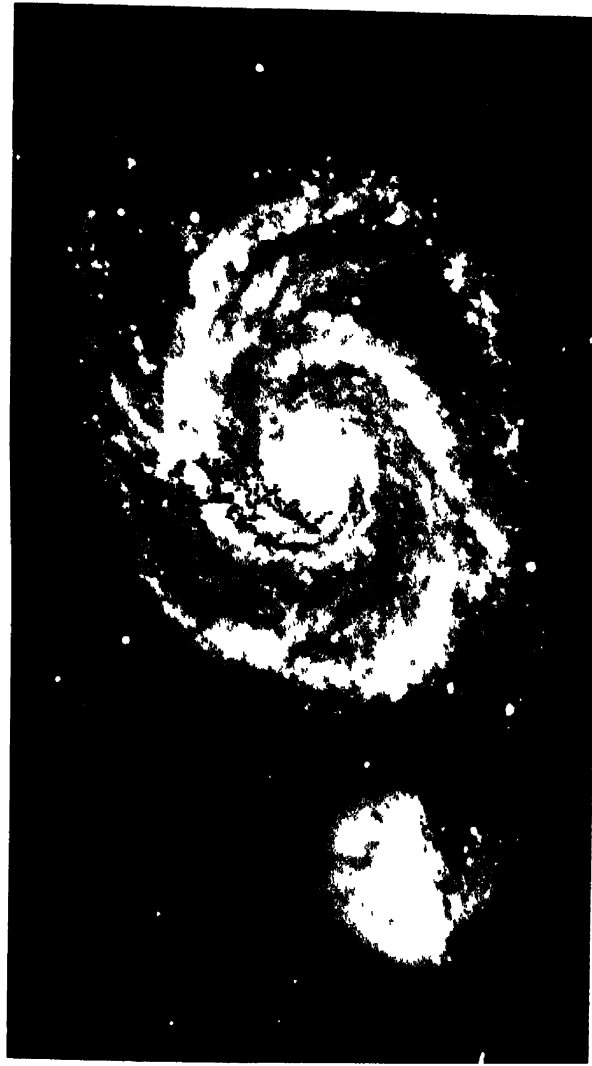
ইহার দীর্ঘব্যাস ৩ লক্ষ আলোকবর্ষ। আপন মেরুদণ্ড অবলম্বন করে' ছায়াপথ একবার আবর্ত্তন করে ৩০ কোটি বৎসরে। ইহার কেন্দ্র হ'তে অনেক দূরে সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত কোন তারকা-গুচ্ছের একটি নক্ষত্রের নাম সূর্য্য (৪৬নং চিত্র)। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে
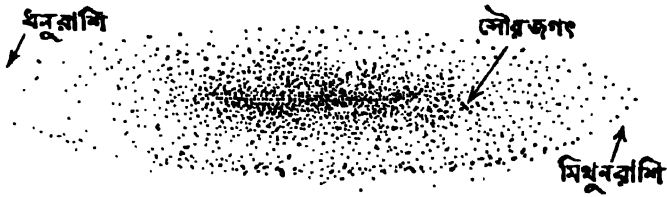
৪৬নং চিত্র—ছায়াপথ-বিশ্বে সৌরজগৎ

আছে ছায়াপথের অগণ্য নক্ষত্র। নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রগুলির ব্যবধান তার চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু সুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রগুলির দূরত্ববোধ পৃথিবীর কাছে লুপ্ত হ'য়ে যায়,—তাদের সে একত্র-সন্নিবিষ্ট মনে করে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ছায়াপথের অন্তর্গত বহুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রগণকে এইজন্যই আমরা আকাশবলয় বা আলোকপথরূপে আকাশে দেখি। ছায়াপথের যে-কোন নক্ষত্র হ'তেই ছায়াপথের দূরবর্ত্তী অংশকে আকাশবলয়রূপে দেখা যাবে। মিথুনরাশির সন্নিকটে ছায়াপথের সীমানার অংশ, সেজন্য আমরা ঐ অংশটিকে ক্ষীণ দেখি—ধনুরাশির নিকটে ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অংশ থাকায় আমরা সেখানে নক্ষত্র-সমষ্টিকে উজ্জ্বল দেখি।

ছায়াপথে একলক্ষ কোটি নক্ষত্র, ১৫০টি বাষ্পময় গ্রহরূপী নীহারিকা

এবং বহু আকৃতিহীন উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ নীহারিকা আছে।* কতকগুলি নক্ষত্র একক রয়েছে, কতকগুলি একত্রে তারকাগুচ্ছের সৃষ্টি করেছে, কতকগুলি ভেঙ্গে চুরে যুগলে পরিণত হয়েছে, কতকগুলি আবার গ্রহ উপগ্রহ উল্কা প্রভৃতির জন্ম দিয়েছে। এই সকল জ্যোতিষ্ক, তাদের বিচিত্র গতিবিধি নিয়ে ছায়াপথে বর্ত্তমান। উত্তরভাদ্রপদানক্ষত্রের সমীপস্থ ছায়াপথের নিকটতম বিশ্বের দূরত্ব ৯ লক্ষ আলোকবর্ষ। আবিষ্কৃত দূরতম বিশ্বটি ছায়াপথ হ'তে ১৪ কোটী আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

আমরা জানি, ছায়াপথ অগণ্য নক্ষত্রাদির সমষ্টি। আবার এমন অনেক বিশ্বও আছে যারা এখনও নক্ষত্রসমষ্টিতে পরিণত হয়নি —তবে হবার পথেই চলেছে। আবর্ত্তমান এই সকল নীহারিকা বা বিশ্বই নক্ষত্রের জন্ম দেয়। উত্তরভাদ্রপদা নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী বিশ্বটির (M 31) বহিরাংশ নক্ষত্রে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় অংশ এখনও সম্ভবতঃ বাষ্পীয় অবস্থায়।

উপগ্রহসৃষ্টির মূলে আছে গ্রহ, গ্রহ ও যুগল-নক্ষত্রের মূলে নক্ষত্র, নক্ষত্রের মূলে আছে এক একটি দ্বীপজগৎ বা বিশ্ব। এই সকল বিশ্বলোক কি করে' সৃষ্ট হ'ল, তা এখনও জানা যায়নি। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, এই সকল বিশ্বলোক স্বয়ম্ভু।

* ছায়াপথ-বিশ্বটি একটি নীহারিকা, আবার ছায়াপথের অন্তর্গত স্তূপীভূত বাষ্পরাশিকেও নীহারিকাই বলা হয়। এই সকল বাষ্পরাশি হ'তে নক্ষত্র জন্মিতে পারে না। কিন্তু ছায়াপথের ন্যায় এক একটি দ্বীপজগৎ হ'তে অগণিত নক্ষত্রের জন্ম হ'তে পারে।

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়

## উপসংহার

ব্রহ্মাণ্ড সসীম কিংবা অসীম তাই নিয়ে একটা বিতর্ক আছে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মাণ্ড সসীম, কেহ কেহ বলেন অসীম। সীমা কোথাও থাক্ বা না থাক্ ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি এমনই কল্পনাতীত যে, সসীম হ'লেও ইহাকে স্বচ্ছন্দে অসীমের পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

* * * *

পদার্থের যে বিভাগ পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং যার চেয়ে সূক্ষ্মতর সত্তা হ'তে পারে না, মহর্ষি কপিল বস্তুর সেই সূক্ষ্মতম অংশের নাম দিয়েছেন অব্যক্ত অথবা প্রধান। তাঁর সাংখ্যে আছে ব্রহ্মাণ্ড কোন সময়ে অব্যক্তময় থাকে। অব্যক্তের বিনাশ নাই—ইহা সর্ব্বব্যাপী ও অব্যয়। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ সৃষ্টির মূল কারণ এই অব্যক্ত। সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বব্যাপী অব্যক্ত সাম্যভাবে বিরাজ করে। অব্যক্তে নিহিত শক্তি একদিন ক্রিয়াশীল হয়। সেদিন সৃষ্টির সূত্রপাত—ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত হয়ে পড়ে। অব্যক্তের সংশ্লেষণে পদার্থ রূপ হ'তে রূপান্তর গ্রহণ ক'রে চলে—এমনি করে' একদিন আবার শক্তির সমাধি ঘটে। সেদিন আরম্ভ হয় পদার্থের বিশ্লেষণ—ক্রমে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যায়। সে-ই প্রলয়। মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একসঙ্গে প্রলয় ঘটে না—

খণ্ড-প্রলয় সম্ভব। ব্রহ্মাণ্ডের একস্থানে যখন প্রলয়—অন্যত্র তখন সৃষ্টির লীলা। একের প্রলয়ে অন্যের সৃষ্টি।

আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে উপরোক্ত দ্বিবিধ দার্শনিক মতেরই সমর্থক আছে। বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে' সৃষ্টির আদি ও অন্ত সম্বন্ধে এ যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাদের মধ্যে কোন কোনটা সাংখ্যের অনুরূপ, কোন কোনটা জৈমিনির, আবার কোন কোনটা উভয় হ'তেই পৃথক্। ব্রহ্মাণ্ড এত বিরাট এবং এত বস্তু ও ঘটনাবহুল যে, তাদের সমন্বয়ে ভবিষ্যতের অন্তে ইহার অবস্থা কি হ'বে, অতীতের আদিতেই বা কি ছিল, তার কোন নিঃসংশয় মীমাংসা পণ্ডিতগণ দিতে পারেন না। কিন্তু বিজ্ঞানের এই উন্নতির দিনে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করে' বর্ত্তমানের পণ্ডিতেরা সৃষ্টিতত্ত্বের যেরূপ ব্যাখ্যা করছেন, তার সহিত যন্ত্রহীন ভারতের সুপ্রাচীন দার্শনিক তথ্যগুলির মিল দেখে আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

* * * *

এ কালের কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—ব্রহ্মাণ্ডে একদিন তাপের মৃত্যু ঘট্‌বে। উষ্ণ পদার্থ থেকে তাপ সঞ্চালিত হ'য়ে শীতল পদার্থে যায়। এই প্রকারে তপ্ত পদার্থ ক্রমশঃ শীতল হ'য়ে পড়ে, শীতল বস্তু উষ্ণ হয়। ক্রমে ক্রমে এমন এক সময় আস্‌বে, যখন ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু সমান তাপমাত্রায় পৌঁছে যাবে। সেই হবে তাপের মৃত্যু—তখন আর উত্তাপ একস্থান থেকে অন্যত্র সঞ্চালিত হ'বে না। শক্তির খেলাই যদি এমনি করে বন্ধ হ'য়ে যায়—ব্রহ্মাণ্ডে নূতন আর কিছু ঘট্‌বে না। কালও হয়ত

থাকবে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে! এরূপ অবস্থা এক হিসাবে প্রলয়েরই নামান্তর।

ভবিষ্যতের অনন্ত গর্ভ থেকে তাপের মৃত্যু-দিবসটিকে আবিষ্কার করা এখনও সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি এবং সেদিন যখন আসবে তখন তার সাক্ষ্য নিতে মর্ত্ত্যালোকের একটি মানুষও অবশিষ্ট থাকবে না—তার বহুপূর্ব্বেই মানবজাতি পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হ'বে।

*   *   *   *

হিন্দু-জ্যোতিষে সৃষ্টির আরম্ভ থেকে প্রলয় পর্য্যন্ত সময়কে কল্প বলে। সৃষ্টি ক্রমে প্রলয়ের দিকে অগ্রসর হয়, প্রলয়ান্তে আবার সৃষ্টি। সৃষ্টি-চক্রের প্রতি আবর্ত্তনে এক এক কল্পের অবসান হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগে এক মহাযুগ। এক সপ্ততি মহাযুগে এক মন্থ। চতুর্দ্দশ মন্থ(১) ও তাদের পঞ্চদশ সন্ধি একত্রে এক কল্প(২)। এক কল্পের পরিমাণ ৪৩২০০০০০০০ বৎসর; ব্রহ্মাণ্ডে এখন শ্বেতবরাহ কল্প চলেছে। এ পর্য্যন্ত এ কল্পের কিঞ্চিদধিক ১৯৭২৯৪৯০০০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সম্প্রতি সপ্তম মন্থর অষ্টাবিংশতিতম মহাযুগে চতুর্থযুগ বা কলিকাল আরম্ভ হয়েছে।

(১) চতুর্দ্দশ মন্থর নাম—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তমজ, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি।

(২) ত্রিশ কল্প—শ্বেতবরাহ, নীললোহিত, বামদেব, গাথান্তর, রৌরব, প্রাণ, বৃহৎকল্প, কন্দর্প, সত্য, ঈশান, ধ্যান, সারস্বত, উদান, গরুড়, কৌর্ম্ম (পূর্ণিমা), নারসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষ্ণুজ, সৌর, সোম, ভাবন, সুপ্তমালী, বৈকুণ্ঠ, আর্চ্চিষ, বল্মীকল্প, বৈরাজ, গৌরী, মাহেশ্বর, ও পিতৃকল্প (অমাবস্যা)। ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার একমাস। এইরূপ দ্বাদশ মাসে ব্রহ্মার বৎসর, শতবর্ষ আয়ুঃকাল।

ারম্ভের প্রায় দুইশত কোটি বৎসর পরে ভূসৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বয়ঃক্রম এখন ১৯৫৫৮৮৫০৩৬ বৎসর। বিগত ১৮৫৬ শকাব্দে কলিযুগের ৫০৩৫ বৎসর চলে গেছে। এই বৎসরের কল্যতীতাব্দ ৫০৩৬। কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর—কলি শেষ হ'তে এখনও ৪২৬৯৬৪ অব্দ বাকী আছে। তারপরে উনত্রিংশৎ মহাযুগের সত্যযুগ সুরু হ'বে।

হিন্দু জ্যোতিষীরা কি প্রণালী অবলম্বনে এই সকল বর্ষসংখ্যা নিরূপণ করেছিলেন তার কোন ইতিবৃত্ত আমরা জানি না। কিন্তু তাঁরা পৃথিবীর যে বয়স নির্দ্ধারণ করে' গেছেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের আধুনিক সিদ্ধান্তের সহিত তার কোনই অনৈক্য দেখা যায় না। এ যুগের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও বল্‌ছেন পৃথিবীর বয়ঃক্রম প্রায় দু'শো কোটি বৎসর।

* * * * *

আজকাল যে সকল উপায়ে পৃথিবীর বয়স নির্ণীত হ'য়ে থাকে, তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বৃষ্টিপাতের পর যে জল মাটীর নীচে প্রবেশ করে, ভূগর্ভের কিছু কিছু লবণ তাতে দ্রবীভূত হ'য়ে যায়। এই নোণা জল প্রস্রবণ-পথে বাইরে এসে নদী দিয়ে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে—লবণ বাষ্পীভূত হ'তে পারে না, সমুদ্রেই থেকে যায়। মেঘ হ'তে আবার বৃষ্টি হয়, আবার কিছু লবণ ভূভাগ থেকে সাগরে চালান যায়। এইভাবে বছরের পর বছর সাগরজলে নূনের ভাগ বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর শৈশবে তার সাগর জল নোণা ছিল না—যত দিন যাচ্ছে, সমুদ্রের জল

তত অধিকতর নোণা ও বিস্বাদ হয়ে পড়্ছে। প্রতি বৎসর পৃথিবীর সকল নদী যত লবণ সমুদ্রে নিয়ে যায়, তাই দিয়ে কত বৎসরে সমুদ্রের জল এখনকার মত নোণা হ'তে পারে—এই হিসাব থেকে পৃথিবীর বয়সের একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। প্রণালীটি স্থূল হ'লেও খুব বেশী ভুলের সম্ভাবনা নাই।

* * * * *

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবী সৃষ্ট হয় প্রায় দু'শো কোটি বৎসর পূর্ব্বে। প্রারম্ভে সমগ্র পৃথিবীই ছিল বাষ্পময়—ক্রমে সেই বাষ্প হ'তেই জল ও স্থলের উৎপত্তি হয়েছে। প্রথমাবস্থায় পৃথিবীর ভ্রমণকক্ষের কোন সঠিক নির্দ্দেশ ছিল না—সেই সময়ে সূর্য্যের আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠ হ'তে কিছু বাষ্প বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে চন্দ্রের জন্ম হয়। ক্রমশঃ পৃথিবীর ভ্রমণকক্ষ সূর্য্যের চারিদিকে ও চন্দ্রের কক্ষ পৃথিবীর চারিদিকে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে পড়ে। ঐ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ভ্রমণ করে' পৃথিবীর বর্ষচক্রে নিয়মিত ঋতুপরিবর্ত্তন সুরু হ'ল। ধীরে ধীরে জল, স্থল ও বাষ্পময় পৃথিবীর আবহাওয়ায় প্রাণিজন্ম সম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল। তখন ভূপৃষ্ঠে প্রথম বর্গের প্রাণী জীবাণু-কীটাদির আবির্ভাব হয়। এদেরই ক্রম-বিবর্ত্তনে একদিন উচ্চতর জীব-জন্তু ও অবশেষে মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে।

আদি মানুষের বয়স কত এখনও তার নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত হয়নি। ইতিহাস খুব বেশী অতীতের সংবাদ দিতে পারে না। বিগত চার পাঁচ সহস্র বৎসরের মানব-কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব্ব অব্দসমূহের বিবরণ অধিকাংশই অসম্পূর্ণ। এর পূর্ব্বেকার সুদীর্ঘকাল প্রাগৈতিহাসিক যুগ। নৃতত্ত্ববিদ্গণ প্রাগৈতি-

হাসিক যুগকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। পুরাকালে মানুষ যখন ধাতব যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতে শিক্ষা করে নাই, তখন তারা দৈনন্দিন জীবননির্ব্বাহে পাথরের তৈয়ারী যন্ত্রাদি ব্যবহার করত। সময়ের সাথে সাথে তাদের প্রস্তর-খোদাই কাজেরও ক্রমোন্নতি হয়। এজন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথমাংশকে প্রস্তর-যুগ বলে এবং প্রস্তর-যুগের প্রথমাংশ অধুনা পুরাতন-প্রস্তরযুগ নামে পরিচিত। আদি মানবের জন্ম এই পুরাতন প্রস্তরযুগের প্রারম্ভে। ভূগর্ভের কোন্ স্তরে কিরূপ কঙ্কাল ও মাথার খুলি পাওয়া গেল এবং সেই স্তরে যে প্রকার খোদাই করা প্রস্তরের অস্ত্রাদি পাওয়া যায়—সেই থেকে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ আদিম অধিবাসীর বয়স নিরূপণ করেন। তাঁদের অনুমান, প্রায় দুই তিন লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রথম মানব-জাতীয় জীবের জন্ম হয়। এক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার মানবেরও যে আকৃতি ও প্রকৃতি কল্পনা করা হয়েছে, তা'তে তাদের আধা-মানুষ বলা যেতে পারে। বর্ত্তমান যুগের মানব সেই আধা-মানুষের এক লক্ষ বছরের প্রগতির ফল।

* * * * *

মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার দিন দিন বেড়ে চলেছে। এমনি ক্রমোন্নতিতে কোন এক ভবিষ্যৎকালে হয়ত পৃথিবীতে এমন এক মানব সম্প্রদায় গড়ে উঠ্‌বে, যাদের মধ্যে এ যুগের মানুষের চিহ্ন-মাত্রও থাক্‌বে না—তারা প্রত্যেকে হ'বে আমাদের এক একজন অতিমানব। আবার তাদের ভবিষ্যতে হয়ত তাদের অতিমানব হ'বে। কিন্তু এ ধারাবাহিকতা চিরকাল একইভাবে চল্‌তে পারে না।

জীবনের উৎসমূলে যে সূর্য্য, যে সূর্য্যের অমিত তেজে মর্ত্ত্য-

প্রকৃতি সঞ্জীবিত—জ্যোতিষ বলে সেই সূর্য্যই আবহমান কাল ঠিক এ অবস্থায় থাকবে না। সূর্য্য ক্ষয়শীল। প্রতি সেকেণ্ডে তার ৫,০০০,০০০ টন ওজন কমে' যাচ্ছে। এই হারে ক্ষয় হ'য়েও দু'-চার কোটি বৎসরে সূর্য্যতেজের যে হ্রাস, তাতে সূর্য্য বিশেষ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে না, ভূপৃষ্ঠের প্রাণীদেরও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু একলক্ষ কোটি বৎসরে সূর্য্যের যে ক্ষয়, পৃথিবীর পক্ষে তা' সামান্য নয়। তা' ছাড়া সূর্য্য হ'তে পৃথিবীর দূরত্ব তখন আরো বেড়ে যাবে। এই দুই কারণে সেই সময়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা এখন অপেক্ষা অন্ততঃ ৩০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ কম থাকবে—জল-ভাগ সর্ব্বাংশে বরফে রূপান্তরিত হ'য়ে যাবে, তখন পৃথিবীর জীবলোকের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কোন কৃত্রিম পন্থাবলম্বনে তখনকার উন্নত মানুষ হয়ত আরো কিছুকাল বাঁচ্‌তে পারবে, কিন্তু প্রকৃতির সাথে লড়াই করে' সে জীবন দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে না।

শুধু পৃথিবী নয়, সূর্য্যের এই বার্দ্ধক্যে সমগ্র সৌরজগৎই অনেকটা শীতল হ'য়ে পড়্‌বে। শুক্রগ্রহের এখন যে তাপমাত্রা তাতে সেখানে প্রাণী থাক্‌তে পারে না। কিন্তু তখনকার শুক্রে যে আব্‌হাওয়ার সম্ভাবনা, পৃথিবীতে এখন সেই আব্‌হাওয়া বর্ত্তমান। সুতরাং সেই একলক্ষকোটি বৎসর পরে পৃথিবী যখন থাকবে বরফময়, হয়ত শুক্রে তখন জন্ম হ'বে জীবের। সম্ভবতঃ শুক্রও আবার একদিন এইরকম মানুষের লীলাভূমি হ'য়ে উঠ্‌বে। তারও পরে আর একদিন বুধগ্রহের পালা সুরু হওয়া বিচিত্র নয় —যদি ততদিনে বুধপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের আবির্ভাব হয়।

এই এক লক্ষ কোটি বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর প্রাকৃতিক আবেষ্টনেরও আবার আমূল পরিবর্ত্তনের সম্ভাব্যতা রয়েছে। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবীর জলরাশিতে যে জোয়ার ভাটা খেলে, তাতে পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন কিঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই বাধায় পৃথিবীর দিনমান চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা একটু একটু বড় হ'য়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধির হার অবশ্য অতি সামান্য—সহস্র বৎসরে এক সেকেণ্ডের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। তথাপি ক্রমশঃ এমন সময় আস্‌বে, যখন পৃথিবীর দিনমান হবে ২৫ ঘণ্টা—তার পরে আরো বেশী। ক্রমে পৃথিবী তার মেরু অবলম্বনে একবার আবর্ত্তন কর্‌বে ৩৬৫ দিনে। সুতরাং তখন পৃথিবীর দিনমান তার এক বৎসরের সমান হ'বে। সে সময়ে পৃথিবীর একই পৃষ্ঠ থাক্‌বে সর্ব্বদা সূর্য্যাভি-মুখে, অপর পৃষ্ঠ অসূর্য্যম্পশ্য; একদিকে যেমন চির-দিন, তার বিপরীত দিকে তেমনি চির-রাত্রি। দুই পৃষ্ঠে তখন আবহাওয়ারও হ'বে বিস্তর ব্যবধান। এ অবস্থায় সেকালের মানবজীবনে বহুবিধ বিপর্য্যয় আশঙ্কা করা যেতে পারে।

কিংবা এমনও হ'তে পারে যে, সৌরজগতের পরমায়ু শেষ হ'তে আর বেশী দেরী নাই। প্রতিবৎসরই দেখা যায়, পাঁচ ছয়টি নক্ষত্র হঠাৎ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—তাদের nova বা নবতারা বলে। অদূর ভবিষ্যতে সূর্য্যেরও ঐরূপ নবতারা হওয়া অসম্ভব নয়। সূর্য্য যদি অকস্মাৎ ঐরূপ উদ্দীপ্ত হ'য়ে পড়ে, তার দেহ হ'তে যে তাপ বিকীর্ণ হ'বে, তাতে পৃথিবীর সাগরজল সিদ্ধ হ'বে, ভূভাগের গাছপালা ও প্রাণিকুল হ'বে ভস্মীভূত।

* * * * *

অগণিত অণু-পরমাণু, গ্রহ উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্রপুঞ্জ, তারকাগুচ্ছ প্রভৃতি নিয়ে ছায়াপথ একটি বিশ্বলোক, যার মধ্যে এক কোণে আমাদের আবাসস্থান। অনন্তদেশবিস্তৃত মহাকাশে এইরূপ অগণ্য বিশ্বলোক আবর্ত্তন ও ভ্রমণ করে। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীয় বিপুল শক্তিকে অবলম্বন করে' অণুপরমাণু হ'তে আরম্ভ করে' এক একটি বিশ্ব পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত হ'তে পারে। আবিষ্কৃত দূরতম বিশ্বলোক চৌদ্দ কোটি বৎসরে তার আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পাঠিয়ে অনন্ত-কালের সম্ভাবনার আভাস দেয়।

সম্মুখে অনন্ত স্থান-কাল-শক্তি-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড, তার মধ্যে এককণা শক্তি বিশিষ্ট মর-জগতের ক্ষুদ্রমানব। মহাকাশে তার স্থান কোথায়? ইহা সম্যক্ বুঝতে পারলে মানুষকে নগণ্য, তুচ্ছ মনে হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এককণা ছায়াপথ, তার মধ্যে একপ্রান্তে একটি তারকাগুচ্ছের একটি সাধারণ নক্ষত্রের নাম সূর্য্য, সূর্য্যের একটি ক্ষুদ্র গ্রহের নাম পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে থাকে মানুষ। মানুষের কি মূল্য আছে?

তবু মানুষ নগণ্য নয়। বিশ্বশক্তির একবিন্দু মানুষ পেয়েছে, তার দ্বারা সে অসীম শক্তির সন্ধান করে, নিত্য নূতন জ্ঞানলাভ করে, অসীমকে জান্‌বার চেষ্টায় প্রাণপাত করে। সেই চেষ্টাই তাকে অমূল্য করেছে।

# পরিশিষ্ট

( পণ্ডিতসমাজ অধুনা গ্রহগণের আবর্ত্তনকাল, প্রদক্ষিণকাল, ও সূর্য্য হতে দূরত্ব এবং নক্ষত্রাদির সংখ্যা ও দূরত্ব প্রভৃতি যেরূপ নির্দ্দেশ করেছেন, এস্থলে তাই সন্নিবিষ্ট হ'ল। )

প্রতি সেকেণ্ডে আলোকের গতি—১৮৬,০০০ মাইল
আলোকবর্ষ—৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল

## সূর্য্য

ওজন—৩৩১১০০ পৃথিবী
ঘনত্ব—জল × ১·৪ বা পৃথিবী × ১/৪
ব্যাস—৮৬৩,৭০০ মাইল
আবর্ত্তনকাল—২৫ দিন, ৫ ঘণ্টা, ৩৭ মিনিট

## চন্দ্র

ব্যাস—২১৬০ মাইল .
ঘনত্ব—জল × ৩·৪
আবর্ত্তনকাল—২৭ দিন, ৪ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিট, ১১·৫ সেকেণ্ড
পৃথিবী হ'তে দূরত্ব—২৪০,০০০ মাইল
পৃথিবীকক্ষের সহিত চন্দ্রকক্ষের কোণ—৫° ৮′ ৪০″
পৃথিবী প্রদক্ষিণকাল—২৭ দিন, ৪ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিট, ১১·৫ সেকেণ্ড
সূর্য্য প্রদক্ষিণকাল—৩৫৪·৬৫ দিন
চান্দ্রমাস—২৯ দিন, ১২ ঘণ্টা, ৪৪ মিনিট, ৩০ সেকেণ্ড

# গ্রহদিগের দূরত্ব প্রভৃতি

| গ্রহ | আবর্ত্তনকাল | প্রদক্ষিণকাল | সূর্য্য হ'তে দূরত্ব (লক্ষ মাইল) | ব্যাস (মাইল) | ঘনত্ব (জল — ১) | ওজন (পৃথিবী — ১) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ | ৮৭·৯৭ দিন | ৮৭·৯৭ দিন | ৩৬০ | ৩১১০ | ৩·৫০ | ·০৪ |
| শুক্র | ২২৪·৭০ দিন | ২২৪·৭০ দিন | ৬৭০ | ৭৭০৫ | ৪·৮৬ | ·৮১ |
| পৃথিবী * | ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৪·১ সেকেণ্ড | ৩৬৫·২৬ দিন | ৯২৮ | ৭৯১৭ | ৫·৫৩ | ১·০০ |
| মঙ্গল | ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিঃ ২২·৬ সেকেণ্ড | ৬৮৬·৯৮ দিন | ১৪১০ | ৪২০৭ | ৩·৯৬ | ·১১ |
| সীরিস্ | | ১৬৮১·৪৫ দিন | | ৪৮০ | | |
| বৃহস্পতি | ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিঃ | ৪৩২২·৫৯ দিন | ৪৮৩০ | ৮৬৭৪০ | ১·৩৪ | ৩১৬·৯০ |
| শনি | ১০ ঘণ্টা ১০ মিঃ | ১০৭৫৯·২০ দিন | ৮৮৬০ | ৭১৫৩০ | ·৭১ | ৯৪·৯০ |
| ইউরেণাস্ | ১০·৭৫ ঘণ্টা | ৩০৬৮৫·৯০ দিন | ১৭৮১০ | ৩১৭০০ | ১·২৭ | ১৪·৬৬ |
| নেপচুন্ | ১৫·২০ ঘণ্টা | ৬০১৮৭·৬০ দিন | ২৭৯২০ | ৩১১০০ | ১·৫৮ | ১৭·১৬ |
| প্লুটো | | ৯১০১১ দিন | ৩৭২০০ | | | |

* পৃথিবীর কক্ষপথের সহিত তার বিষুবরেখার কোণ = ২৩°২৭′

## সূর্য্য হ'তে কয়েকটি বিশিষ্ট নক্ষত্রের দূরত্ব

| | |
|---|---|
| ধ্রুবতারা—৪৭ | আলোকবর্ষ |
| লুব্ধক—৮·৬ | " |
| রোহিণীর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র—৫৭ | " |
| আর্দ্রা—২০০ | " |
| অভিজিৎ—২৬ | " |
| মহিষাসুর ( আল্‌ফা )—৪·৩ | " |
| স্বাতী—৪১ | " |
| ব্রহ্মহৃদয়—৫২ | " |

### ছায়াপথ

ছায়াপথের আবর্ত্তনকাল—৩০০,০০০,০০০ বৎসর

ছায়াপথের গতি—সেকেণ্ডে ২২০ মাইল

ছায়াপথের দীর্ঘব্যাস—৩০০,০০০ আলোকবর্ষ

ছায়াপথের ক্ষুদ্রব্যাস—৬০,০০০ আলোকবর্ষ

ছায়াপথের নক্ষত্রসংখ্যা—১০০০,০০০,০০০,০০০

ছায়াপথের নক্ষত্রের ব্যাস—৪০০০ মাইল হ'তে ৪০,০০০,০০০ মাইল

ছায়াপথের গ্রহরূপী নীহারিকার সংখ্যা—১৫০

ছায়াপথের তারকাগুচ্ছের সংখ্যা—৭০

প্রতি তারকাগুচ্ছের নক্ষত্রসংখ্যা—৫০,০০০

## দ্বীপজগৎ বা বিশ্ব

আনুমানিক আবর্ত্তনবেগ—সেকেণ্ডে ১০০০ মাইল।

ব্যাস—৩০,০০০ আলোকবর্ষ হ'তে ৩০০০০০ আলোকবর্ষ

দুইটি বিশ্বের :সাধারণ দূরত্ব—১০০০০০০ আলোকবর্ষ

আবিষ্কৃত বিশ্বের সংখ্যা—২০০০০০০

## তুলনামূলক দূরত্ব

সৌরজগৎ হ'তে নিকটতম নক্ষত্র (প্রক্সিমা মহিষাসুর)
—৪·২৭ আলোকবর্ষ

সৌরজগৎ হ'তে নিকটতম তারকাগুচ্ছ (ওমেগা মহিষাসুর)
—২১০০০ আলোকবর্ষ

সৌরজগৎ হ'তে দূরতম তারকাগুচ্ছ (হারকিউলাস্)
—২৩০, ০০০ আলোকবর্ষ

সৌরজগৎ হ'তে নিকটতম বিশ্ব বা দ্বীপজগৎ (উত্তরভাদ্রপদা-নক্ষত্রের সমীপস্থ নীহারিকা)—৮৫০,০০০ আলোকবর্ষ

সৌরজগৎ হ'তে আবিষ্কৃত দূরতম বিশ্ব—১৪০,০০০,০০০ আলোকবর্ষ

# নির্ঘণ্ট